সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা

৬ মে ১৯৯৮ পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

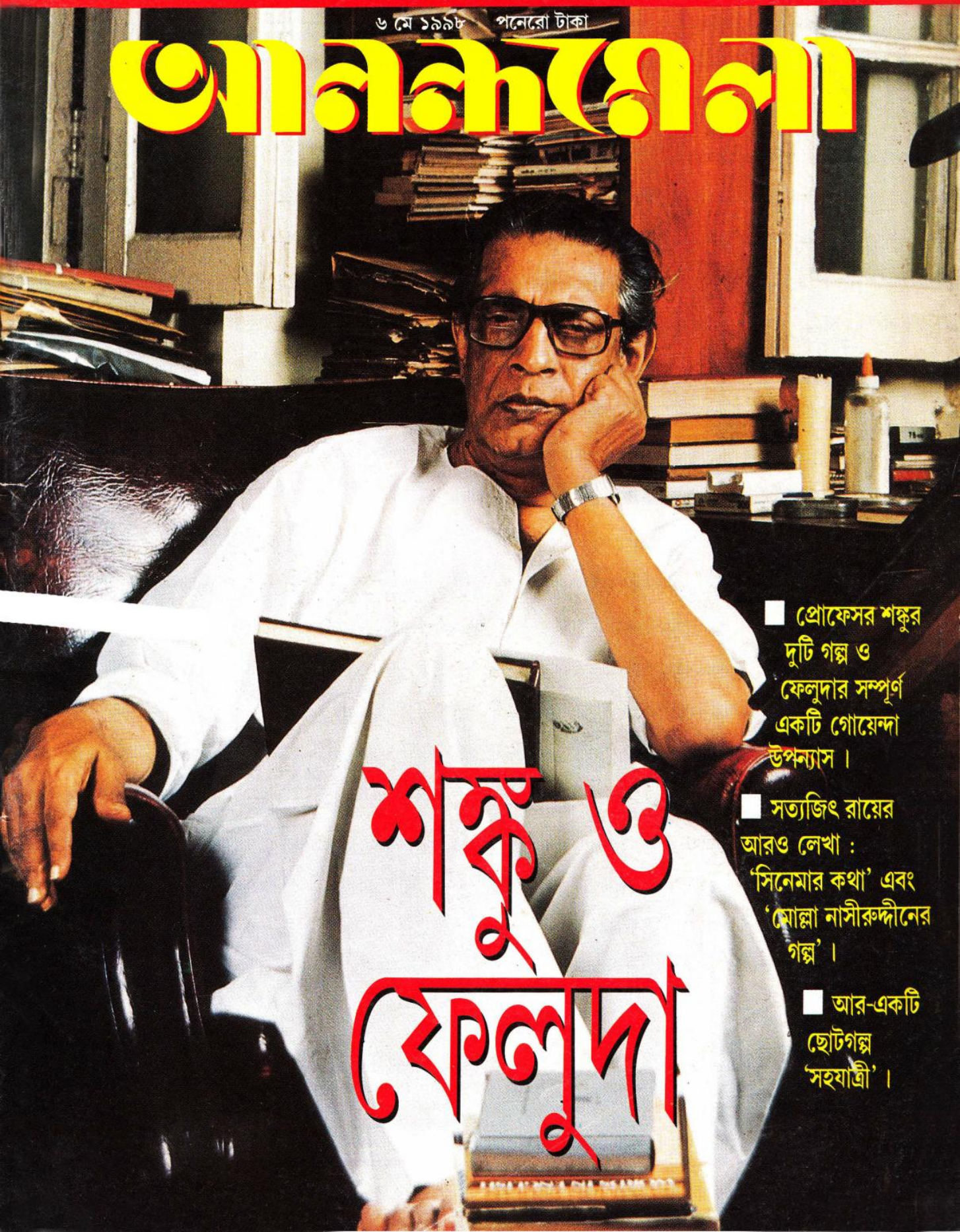

শঙ্কু ও ফেলুদা

- প্রোফেসর শঙ্কুর দুটি গল্প ও ফেলুদার সম্পূর্ণ একটি গোয়েন্দা উপন্যাস।
- সত্যজিৎ রায়ের আরও লেখা : 'সিনেমার কথা' এবং 'মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প'।
- আর-একটি ছোটগল্প 'সহযাত্রী'।

চুলের সমস্যা !

- খুস্কি
- চুলপড়া
- অকালপক্কতা
- অ্যালোপেসিয়া এরিয়েটা

স মা ধা ন

বি শ্বে স র্ব প্র থ ম

ডাঃ সরকারের

এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার

আর্ণিকাপ্লাস

তেলবিহীন হোমিও হেয়ার ভাইট্যালাইজার
চুলের গোড়া প্রাণবন্ত করে

ট্রায়োফার ট্যাবলেট

খাওয়ার হোমিও হেয়ার টনিক
লিভার ও পেটের গোলমাল সারায়-যা
চুলের সমস্যার অন্যতম কারণ

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

- অতিরিক্ত চুল পড়া বন্ধ করে
- অসময়ে চুল পড়া/অকালপক্কতা রোধ করে
- চুলের বৃদ্ধি উন্নত করে • মাথার খুস্কি দূর করে
- চুলের পুষ্টি যোগায় তাই চুল স্বাস্থ্যোজ্জল হয়

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপল অ্যাকশন হেয়ার ভাইট্যালাইজার

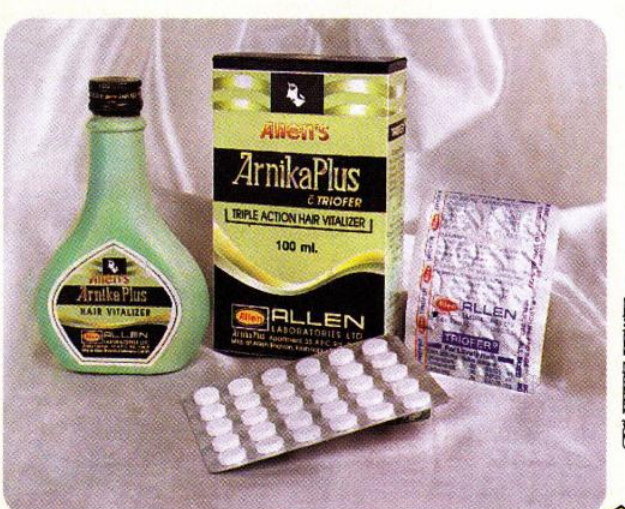

কেশ সমস্যার সমাধানে
পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হোমিও ওষুধ।
প্রসাধন সামগ্রী নয়।

Allen

Mfd. by : **ALLEN LABORATORIES LTD.**
Mktd. by : JupiterAllen (India) Limited
ArnikaPlus Apt. 35, A.P.C.Road, Calcutta - 700 009
Phone : 350 9026, 3510062 Fax : (033)3512285, 3511076

Jupiter Allen Emars
Allen's Dr. Sarkar Group
Serving for a better future

Allen's Ad/PAD/Apt./Beng/03/97

আনন্দমেলা

২৪ বর্ষ ২ সংখ্যা ২২ বৈশাখ ১৪০৫ ৬ মে ১৯৯৮

স ত্য জি ৎ রা য় বি শে ষ স ং খ্যা

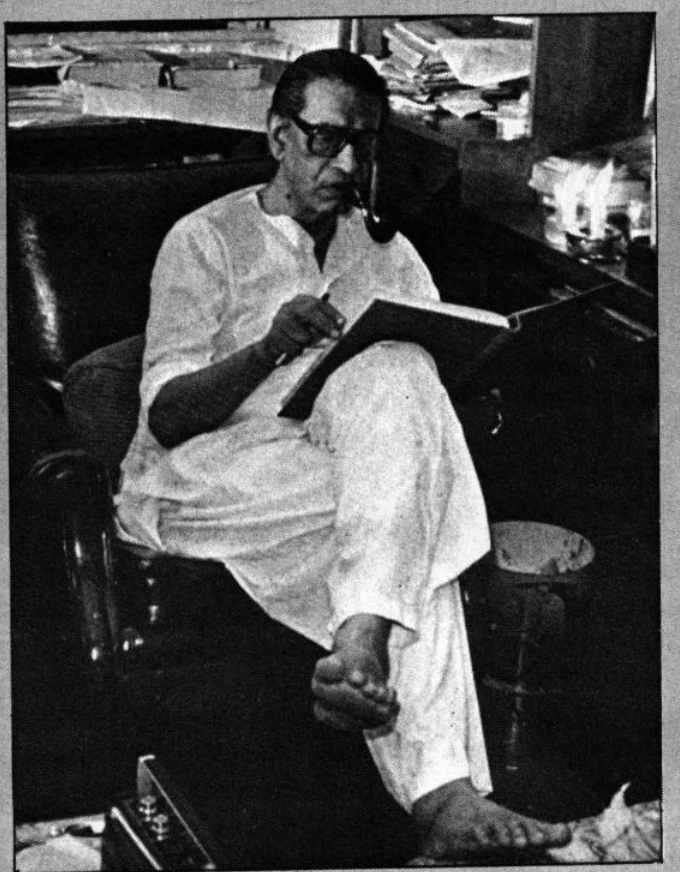

ফোটো : অলক মিত্র

বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক ও সকলের প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়ের অনবদ্য সৃষ্টি— প্রোফেসর শঙ্কু ও গোয়েন্দা ফেলুদা। বিজ্ঞানসাধনায় নিবেদিতপ্রাণ প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে তিনি লিখেছেন অনেক গল্প। বিশ্বের সেরা কল্পবিজ্ঞান কাহিনীগুলির মধ্যে তাঁর এই গল্পগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও রচনাগুণে উচ্চ আসন অধিকার করেছে। নানা বিষয়ের খোঁজখবর রাখেন ফেলুদা। দৃষ্টি তাঁর সদাজাগ্রত। অপরাধীরা তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে না। বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় তিনি সকলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান। সত্যজিৎ রায়ের বহুমুখী প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই লেখাগুলি অমর স্রষ্টার ৭৭তম জন্মদিনে পুনরায় প্রকাশ করা হল। সঙ্গে থাকল তাঁর আরও কয়েকটি লেখা। আমাদের সাহিত্যের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার এই লেখাগুলি কখনও পুরনো হবে না।

প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার

মহাকাশের দূত সত্যজিৎ রায় **১২**

মানরো দ্বীপের রহস্য

সত্যজিৎ রায় **৫০**

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস

গোলাপী মুক্তা রহস্য

সত্যজিৎ রায় **৩১**

ছোটগল্প

সহযাত্রী সত্যজিৎ রায় **৪**

বিশেষ প্রবন্ধ

সিনেমার কথা সত্যজিৎ রায় **১০**

গল্প

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প

সত্যজিৎ রায় **২৮, ৪৮**

অ্যালবাম

বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায় ৬৪

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

সত্যজিৎ রায়। ফোটো : অসিত পোদ্দার

আগামী আকর্ষণ

ব্রিটেনে অ্যাসটেরিক্স

শুরু হচ্ছে অ্যাসটেরিক্সের নতুন কমিক্স।

সঙ্গে অন্যান্য কমিক্স ও নিয়মিত বিভাগ

এই সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগগুলি প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

স ম্পা দ ক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এবিপি লিঃ-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১৫ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা, উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

ছোটগল্প

সহযাত্রী

সত্যজিৎ রায়

ত্রিদিববাবুর সাধারণত একটা হাল্‌কা বই পড়েই সময়টা কেটে যায়। কলকাতা থেকে দিল্লী ট্রেনে যাওয়া। কাজের জন্যই যেতে হয় দু মাসে অন্তত একবার। একটা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি, হেড আপিস দিল্লীতে। প্লেনটা একদম পছন্দ করেন না ত্রিদিববাবু, অতীতে একবার ল্যান্ডিং-এর সময় কানে তালা লেগে গিয়েছিল, সেই তালা ছাড়াতে তাঁকে ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয়েছিল। সেই থেকে তিনি ট্রেনেই যাতায়াত করছেন। কলকাতায় তাঁর বাড়িতে খালি তাঁর স্ত্রী আছেন। একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে গত মাসে, ছেলে আমেরিকায় বায়ো কেমিস্ট্রি পড়ছে। আপিস আর বাড়ি, এই দুটোর মধ্যেই ত্রিদিববাবুর গতিবিধি। অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে বিশেষ কেউ নেই, তবে কাছেই রডন স্ট্রীটের চৌধুরীরা স্বামীস্ত্রীতে মাঝে মাঝে আসেন গল্পগুজব করতে, ত্রিদিববাবুরাও তাঁদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যান।

হাতের বইটা বন্ধ করে রেখে দিলেন ত্রিদিববাবু। একেবারে অপাঠ্য। এবারে হয়ত ঘুমিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিতে হবে। ঘরে আরো তিনটি বার্থে তিনজন লোক, তার মধ্যে তাঁর পাশের লোয়ার বার্থের ভদ্রলোকটি ছাড়া অন্য দুজনেই অবাঙালী। বইটা রেখে ত্রিদিববাবু তাঁর পাশের বার্থের দিকেই চেয়ে

ছিলেন ; তার ফলে বাঙালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। মোটামুটি তাঁরই বয়সী হবেন, মাঝারি রঙ, চুলে এর মধ্যেই অল্প পাক ধরেছে। ভদ্রলোক বোধহয় আলাপের জন্য উৎসুক হয়েছিলেন, কারণ দৃষ্টি বিনিময় হতেই তিনি একটা প্রশ্ন করে বসলেন।

'আপনি দিল্লীতে থাকবেন ক'দিন ?'

ত্রিদিববাবুর কথা বলতে আপত্তি নেই, কারণ সত্যি বলতে কি তাঁর এখন আর কিছু করার নেই। বললেন, 'দুদিন। বুধবার ফিরে আসব।'

'আমারও ঠিক একই ব্যাপার। আপনি কোনো মিটিং অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন কি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমিও একই ব্যাপারে। আমার হল বিজ্ঞাপনের কারবার। দিল্লীতে হেড আপিস। আমাদের আপিসের নাম শুনে থাকতে পারেন। এভারেস্ট

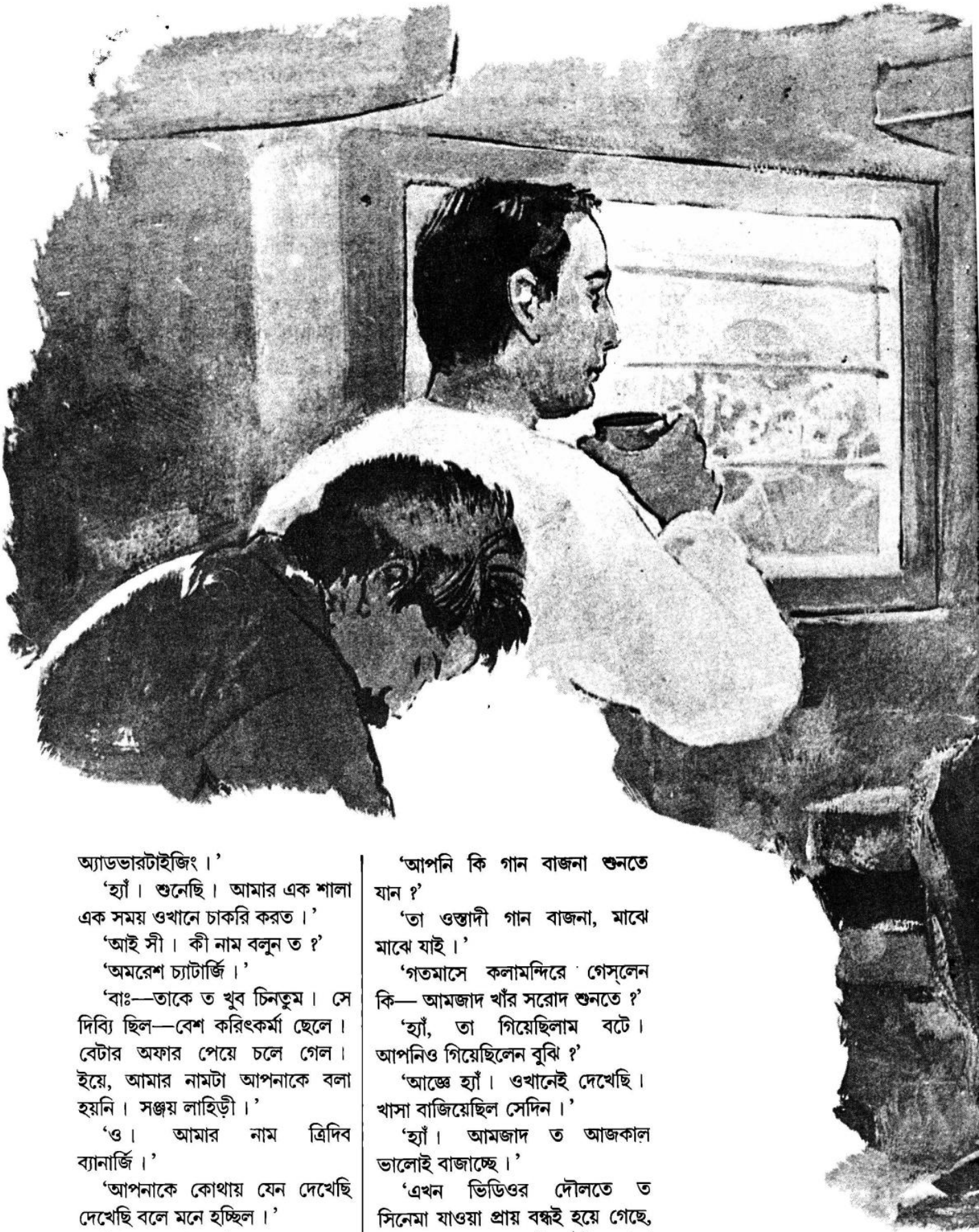

অ্যাডভারটাইজিং।'

'হ্যাঁ। শুনেছি। আমার এক শালা এক সময় ওখানে চাকরি করত।'

'আই সী। কী নাম বলুন ত?'

'অমরেশ চ্যাটার্জি।'

'বাঃ—তাকে ত খুব চিনতুম। সে দিব্যি ছিল—বেশ করিৎকর্মা ছেলে। বেটার অফার পেয়ে চলে গেল। ইয়ে, আমার নামটা আপনাকে বলা হয়নি। সঞ্জয় লাহিড়ী।'

'ও। আমার নাম ত্রিদিব ব্যানার্জি।'

'আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছিল।'

'তা হতে পারে।'

'আপনি কি গান বাজনা শুনতে যান?'

'তা ওস্তাদী গান বাজনা, মাঝে মাঝে যাই।'

'গতমাসে কলামন্দিরে গেস্‌লেন কি— আমজাদ খাঁর সরোদ শুনতে?'

'হ্যাঁ, তা গিয়েছিলাম বটে। আপনিও গিয়েছিলেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওখানেই দেখেছি। খাসা বাজিয়েছিল সেদিন।'

'হ্যাঁ। আমজাদ ত আজকাল ভালোই বাজাচ্ছে।'

'এখন ভিডিওর দৌলতে ত সিনেমা যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে, গান বাজনা শুনতেই যাই মাঝে

মাঝে।'

'তাছাড়া সিনেমা গেলেও, হাউসের যা দুর্দশা মাটিতে ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভ্যাপসা গরম...'

'যা বলেছেন। অথচ ইয়াং বয়সের লাইটহাউস, মেট্রোর কথা ভেবে দেখুন।'

'ওসব দিন চলে গেছে।'

'মনে আছে কলেজ থেকে মাঝে মাঝে চলে আসতুম চৌরঙ্গী। মেট্রোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম। ঠাণ্ডায় প্রাণটা জুড়িয়ে যেত।'

'আমারও ওই হ্যাবিট ছিল।'

'ঠাণ্ডা বলতে মনে পড়ল—দার্জিলিং আর সে দার্জিলিং নেই।'

'জানি। সেই জন্যে ত এবার আমরা মানালি গেলাম। আগে তিন বছরে অন্তত দুবার করে দার্জিলিং যেতাম।'

'আমরাও। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো দৃশ্য ত আর কোথাও নেই। ওই একটা জিনিস পুরোন হবার নয়।'

'আর আধুনিক সভ্যতাও ওর কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না।'

মোগলসরাইতে দু'জন ভাঁড়ে চা খেলেন। কথা আরো চলল। ত্রিদিববাবুর বেশ লাগছিল সঞ্জয়বাবুকে। তাছাড়া কিছু কিছু মিলও বেরিয়ে যাচ্ছিল দুজনের মধ্যে, তাতে আলাপটা জমতে সুবিধে হচ্ছিল। সন্ধের দিকে সঞ্জয়বাবু বললেন, 'একটা আসল প্রশ্নই করা হয়নি। আপনি থাকেন কোথায়?'

'লী রোড।'

'কত নম্বর লী রোড? তিন নম্বরে আমার এক পাঞ্জাবী বন্ধু থাকে।'

'আমার বাড়ির নম্বর সেভেন বাই ওয়ান।'

'দাঁড়ান, আমি ডায়রিতে নোট করে নিচ্ছি। কলকাতায় ফিরে গিয়েও আলাপটা চালু রাখার ইচ্ছে হতে পারে।'

'তা ত বটেই।'

দিল্লীতে এসে অবশ্য দুজনে যে যার পথ ধরলেন। দুজনেই হোটেলে থাকবেন, তবে দুই হোটেলে দুস্তর ব্যবধান। সঞ্জয়বাবু একটা ট্যাক্সিতে চাপবার আগে হাত নেড়ে বলে গেলেন, 'আশা করি কলকাতায় গিয়েও দেখা হবে।'

দিল্লীর মিটিং সেরে কলকাতায় ফিরে এসে ত্রিদিববাবু তাঁর কাজের বাঁধা ছকের মধ্যে পড়ে গেলেন। স্ত্রী শিপ্রাকে একবার সঞ্জয়বাবুর কথা উল্লেখ করেছিলেন। 'এইসব আলাপগুলো ভারি মজার,' বলেছিলেন ত্রিদিববাবু, 'ওই একটি দিনের জন্য ব্যস। কিন্তু ওই একদিনেই কত কথা, কত আলোচনা। তারপর যে যার নিজের জগতে চলে যাও। দ্বিতীয়বার আর দেখা হয় না।'

ত্রিদিববাবু কিন্তু কথাটা ঠিক বলেননি, কারণ কলকাতায় ফেরার তিন সপ্তাহের মধ্যেই সঞ্জয়বাবু এক রবিবারের সন্ধ্যায় এসে হাজির, হাতে বাক্সে মিষ্টি।

'দেখলেন ত, আলাপটাকে গেঁজে যেতে দিলুম না। ভালো আছেন ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—আসুন বসুন। টিভিতে একটা ভালো প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু ত্রিদিববাবুর তাতে আক্ষেপ নেই, কারণ সঞ্জয় লাহিড়ীর আসাটা তিনি পছন্দই করলেন। ত্রিদিববাবু বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন সঞ্জয়বাবুকে।

'আজ থেকে তুমিতে চলে গেলে হত না ?' বললেন সঞ্জয় লাহিড়ী।

'তাতে আমার কোনোই আপত্তি নেই।'

'ভেরি গুড। বেশ বাড়ি তোমার। কদিন আছ এখানে ?'

'বছর সাতেক হল। তুমি থাকো কোথায় ?'

'এখান থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। মিডলটন রো—পঁচিশ নম্বর।'

'আই সী।'

'আসছে শনিবার যাচ্ছ কি ?'

'রবীন্দ্রসদনে ?' ত্রিদিববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। ভীমসেন যোশীর গান আর চৌরাসিয়ার বাঁশী।'

'ইচ্ছে ত আছে যাবার। উদ্যোক্তারা দুখানা টিকিটও পাঠিয়েছেন।'

'চলো, আর তারপর চলো ক্যালকাটা ক্লাবে খাওয়া যাক—আমরা চারজনে।'

'আমি ত মেমবার নই,' বললেন

ত্রিদিববাবু।

'তাতে কী হয়েছে ? তোমরা যাবে আমার গেস্ট হয়ে।'

'তা বেশ ত। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

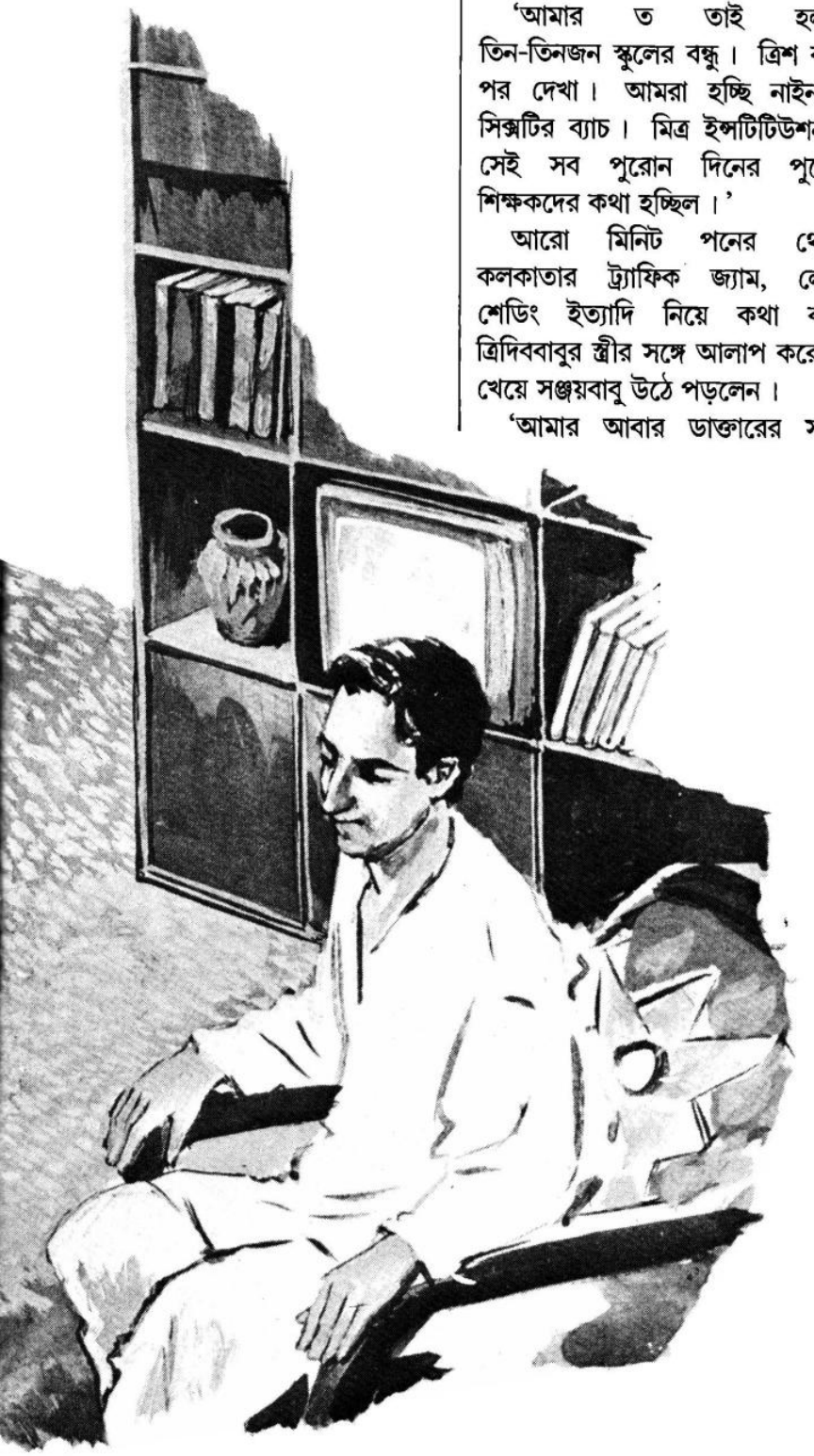

'তুমি এখনো মেমবার হওনি কেন ? এই বেলা হয়ে পড়ো—দেখবে হয়ত অনেক পুরোন বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়ে যাবে।'

'তা ত হতেই পারে।'

'আমার ত তাই হল। তিন-তিনজন স্কুলের বন্ধু। ত্রিশ বছর পর দেখা। আমরা হচ্ছি নাইনটিন সিক্সটির ব্যাচ। মিত্র ইন্সটিটিউশন। সেই সব পুরোন দিনের পুরোন শিক্ষকদের কথা হচ্ছিল।'

আরো মিনিট পনের থেকে কলকাতার ট্র্যাফিক জ্যাম, লোড শেডিং ইত্যাদি নিয়ে কথা বলে ত্রিদিববাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে চা খেয়ে সঞ্জয়বাবু উঠে পড়লেন।

'আমার আবার ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তোমার বাড়ি পথে পড়ল, তাই একবার না এসে পারলুম না। এবার কিন্তু ভাই তোমার আসার পালা—পঁচিশ নম্বর মিডলটন রো। না এলে আমি আর আসছি না।'

'নিশ্চয়ই যাবো।'

'আসি তাহলে—'

'গুড নাইট।'

ত্রিদিববাবু দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বসবার ঘরে ফিরে এলেন। আশ্চর্য ! তাঁর এখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। তিনিও যে ওই একই স্কুলের একই ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। সঞ্জয় ওরফে ফটিক লাহিড়ী ছিল ক্লাসের পয়লা নম্বর বিচ্ছু, আর ত্রিদিব ব্যানার্জির পরম শত্রু, কারণ ত্রিদিব ওরফে দিবু ছিলেন ভালো ছেলের দলে। কী অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে ফটিকের। এর সঙ্গে কি বন্ধুত্ব করা যায় ? বেশ কিছুক্ষণ ভেবে ত্রিদিববাবু স্থির করলেন যে সঞ্জয় আজ আর সেই সঞ্জয় নেই, একেবারে সভ্যভব্য নতুন মানুষ হয়ে গেছে। আর তাকে যখন ত্রিদিববাবুর ভালোই লেগেছে, তখন বন্ধুত্বতে কোনো আপত্তি নেই। তবে এটা ঠিক যে ত্রিদিব কখনো বলবেন না যে তিনি সঞ্জয়ের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন। সেই অতীতকে চাপা রাখাই ভালো, আজ যেটা সত্যি সেটাকেই মানতে হবে।

ত্রিদিববাবু টিভিটা চালু করে দিলেন।

রচনাকাল : ১২/৬/৮৯

'সন্দেশ' পত্রিকায় 'নতুন বন্ধু' নামে বাবার একটি গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের জানুয়ারিতে। আর তার ঠিক দেড় বছর পরের এক খসড়া খাতা থেকে বেরোল 'সহযাত্রী'। একই চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে এই দ্বিতীয় গল্পটি লেখার কারণ যে কী হতে পারে, তা আজ অনুমান করা কঠিন। হয়তো লেখার সময় প্রথমটির কথা উনি ভুলে গিয়েছিলেন, এবং 'ফেয়ার' করতে গিয়ে হঠাৎই মনে পড়ে যায়। সেইজন্যই বোধহয় 'সহযাত্রী' অপ্রকাশিত থেকে গেছে।

সন্দীপ রায়

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বিশেষ প্রবন্ধ

সিনেমার কথা

সত্যজিৎ রায়

যে-কোনো একটা নতুন আবিষ্কার প্রথম-প্রথম যে চমক জাগায়, কিছুদিন পরে মানুষের অভ্যাস হয়ে গেলে আর সে চমকটা থাকে না।

এক-একদিন হঠাৎ যখন বিজলীর গড়বড়ানিতে বাড়ির বাতিগুলো ঝুপ্ করে নিভে যায়, তখন আদ্যিকালের মোমবাতি জ্বালিয়ে বই পড়তে গিয়ে ইলেক্‌ট্রিক লাইটের মহিমা কিছুটা বুঝতে পারা যায়। নয়তো এমনিতে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে দশ মাইল দূরের লোকের সঙ্গে কথা বলে, বা কালো ঘুরন্ত চাকতির উপর পিন বসিয়ে গান শুনে, বা জেটের জোরে একশো জন ছেলে বুড়ো এক সঙ্গে দু-ঘণ্টায় দিল্লী পৌঁছিয়ে আজকের দিনে আমরা আর কেউই বিশেষ অবাক হই না। তেমনিই, সিনেমা দেখতে গিয়ে, 'ছবি নড়ছে' এ ব্যাপারটা আর আজ কারো মনে বিস্ময় জাগায় না। অথচ আজ থেকে সত্তর বছর আগে এই ছবি নড়াটাই মানুষকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

তখন অবিশ্যি সিনেমার গল্প বলার কথাটা লোকের মাথায়ই আসেনি। একেবারে প্রথম যে সিনেমা লোকে পয়সা দিয়ে দেখতে গিয়েছিল—তাতে দেখানো হয়েছিল, একটা ট্রেন স্টেশনে এসে থামছে আর তার আশেপাশে যাত্রী ও কুলির দল ব্যস্ত ভাবে ঘোরাফেরা করছে। ট্রেনের ফোটোগ্রাফ অবিশ্যি লোকে তার অনেক আগেই দেখেছিল। কিন্তু সেতো ছবির ট্রেন, কাজেই চলা অবস্থায় তোলা হলেও ছবিতে সে থেমেই থাকত। চলন্ত ট্রেন দেখতে হলে তখনকার দিনে রেল লাইনের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। হঠাৎ একদিন লোকে এই চলন্ত ট্রেন দেখতে পেলো একটা অন্ধকার ঘরে একটা পর্দার উপর। এতে যে তারা অবাক হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এই চলন্ত ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লোকে বেশ বুঝতে পারল যে সিনেম্যাটোগ্রাফ জিনিসটা এক আশ্চর্য আবিষ্কার। তবে এই আবিষ্কারের দৌড় যে ঠিক কতখানি, আর কি অদ্ভুত তাড়াতাড়ি যে এই আবিষ্কারের উন্নতি হবে, সে কথা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

প্রথম চলন্ত ছবি বাজারে দেখানোর কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে এই নতুন আবিষ্কারের সাহায্যে নতুন ভাবে গল্প বলার একটা উপায় হতে পারে।

সে-যুগে যাঁরা সিনেমা তৈরি করতেন, তাঁরা তাঁদের খরচ তোলার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা নিতেন—যেমন আজকের দিনে টিকিট বিক্রি করে ছবি দেখানো হয়। এমন আশ্চর্য নতুন তামাসা দেখার জন্য লোকে পয়সা দিতে আপত্তি করত না। কিন্তু শুধু ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট গাড়িঘোড়া আর লোকজনের চলাফেরা দেখিয়ে আর কতদিন পয়সা করা যায়? কিছুদিনের মধ্যেই লোকে বলতে আরম্ভ করল—ছবি নড়ছে সে তো বুঝলুম রে বাপু, কিন্তু নড়ে হচ্ছেটা কি? এতে আমোদটা কোথায়?

এর ফলে সিনেমায় এল গল্প। যারা নতুন পড়তে শিখেছে, তাদের যদি কেবল খবরের কাগজ পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে তারা কতদিন চুপ করে থাকবে? বই-পড়িয়েরা গল্পের বই পড়ে যেমন মজা পায়, সিনেমা-দেখিয়েরাও প্রথম গল্পের ছবি দেখে সেই মজা পেলো, আর সেই থেকে দেখতে দেখতে সিনেমার গল্প বলার রীতিটা চালু হয়ে গেল।

গল্প বলার নানান কায়দা পৃথিবীতে বহুদিন থেকেই চলে আসছে। আমাদের গ্রামেই ত আদ্যিকাল থেকে যাত্রা, কবিগান, কথকতা, পাঁচালী এই সবের মধ্যে দিয়ে গল্প বলা হত। পটুয়াদের আবার গল্প বলার একটা মজার কায়দা ছিল, যেটার সঙ্গে হয়ত সিনেমার খানিকটা মিল পাওয়া যেতে পারে। ধরা যাক্ যে পটুয়া রাম-রাবণের যুদ্ধের গল্প বলবে। তারা করত কি—একটা লম্বা কাগজে উপর থেকে নিচে পর পর এই যুদ্ধের প্রধান ঘটনার সব ছবি আঁকত। আঁকা হলে পর কাগজটা তলার দিক থেকে পাকিয়ে গোল করে রেখে দিত। গল্প-বলার সময় সেই পাক খুললে পর পর ঘটনার ছবিগুলো বেরিয়ে পড়ত।

এই সবের তুলনায় সিনেমা হল গল্প বলার একেবারে আনকোরা নতুন কায়দা, যেটার আবিষ্কার আমাদের এই আধুনিক যন্ত্রপাতির যুগেই সম্ভব ছিল।

আমরা ছেলেবেলায় যখন সিনেমা দেখেছি, তখন 'টকি' (Talkie) অথবা কথা-বলা ছবির যুগ আসেনি। কিন্তু তখনই 'সাইলেন্ট' অথবা নির্বাক ছবির গল্প বলার কায়দাটা বেশ ভালো ভাবেই তৈরি হয়ে গেছে। এ হল চল্লিশ বছর আগেকার কথা। তখন কলকাতায় সিনেমা হাউস বেশি ছিল না। হয়ত সবশুদ্ধ আট দশটা। তার কারণ তখন ছবি তোলাই হত অনেক কম। আজ শুধু ভারতবর্ষেই বছরে যত ছবি তোলা হয়, তখন সারা পৃথিবীতেই তার বেশি হত না। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা দেশে তখনই ছবি তোলা শুরু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ছোটদের ভালো লাগবে এমন ছবি বিশেষ কিছু এখানে তৈরি হত না। আমরা যা ছবি সেকালে দেখেছি তা প্রায় সবই আমেরিকায় তোলা। তার মধ্যে কিছু ছিল মজার ছবি—যেমন চার্লি চ্যাপলিন, হ্যারল্ড লয়েড বা বাস্টার কীটনের ছবি—যা দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার জোগাড় হত। আর ছিল অ্যাডভেঞ্চারের ছবি—যেমন ডাগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের থীফ অফ বাগদাদ, বা হিংস্র জানোয়ারে গিজগিজ অ্যাফ্রিকার জঙ্গলে টার্জনের বাহাদুরী।

এসব ছবি যখন দেখেছি তখন এর গল্পে এমন মেতে গেছি যে কোনো সময় মনে হয়নি যে এসবের পিছনে আবার খরচ আছে, পরিশ্রম আছে, কারসাজি আছে। টার্জনের সঙ্গে কুমীরের মারাত্মক লড়াই, বা বাগদাদের চোরের ম্যাজিক কার্পেটে চড়ে উড়ে বেড়ান বা বাস্টার কীটনের 'পোল ভল্ট' করে একতলার বাগান থেকে দোতালার জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একেবারে গুণ্ডার পেটের উপর ল্যাণ্ড করা—এসব দেখে যেমন ভালো লেগেছে,

(এর পর ৬৭ পাতায়)

আনন্দমেলা

৩ জুন ১৯৯৮ মূল্য : ত্রিশ টাকা

আনন্দমেলা খুলেছে বাড়িতে বিশ্বকাপ

প্র চ্ছ দ কা হি নী

কে জিতবে বিশ্বকাপ, কে হবেন সেরা তারকা

লাতিন আমেরিকার 'স্কিল', না ইউরোপের 'পাওয়ার'— এবারের বিশ্বকাপে প্রাধান্য থাকবে কোনটির ? ব্রাজিলের রোনাল্ডোই কি হবেন সেরা তারকা, না কি উঠে আসবেন অন্য কেউ ? এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে জমজমাট প্রচ্ছদকাহিনী। লিখেছেন **তানাজি সেনগুপ্ত**

বিদ্রোহী মারাদোনা

ডিয়েগো মারাদোনা শুধু একজন ফুটবলারই নন, মাঠের বাইরেও তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। রোমে মারাদোনার সঙ্গে কথা বলে তাঁর চাঞ্চল্যকর জীবনের অপ্রকাশিত নানা কাহিনী জানিয়েছেন **রূপক সাহা**, তাঁর সুদীর্ঘ প্রতিবেদনে।

মাঠের ভেতরে, মাঠের বাইরে

বিগত বিশ্বকাপের ফাইনালে মাঠের বাইরেও ঘটেছিল নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক **সুমন চট্টোপাধ্যায়**। তিনি জানাচ্ছেন ফাইনালের সেই ঘটনাবহুল দিনটির কথা।

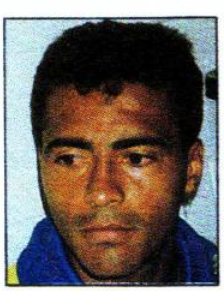

- বিশ্বকাপের চেনা-অচেনা খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আনন্দমেলা
- বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ৩২টি দেশের খেলোয়াড়দের পরিচিতি, সঙ্গে ফোটো
- প্রতিটি দেশের কোচদের 'স্ট্র্যাটেজি' নিয়ে আলোচনা
- বিশ্বকাপের দুর্দান্ত সব ফোটোগ্রাফ, অজস্র পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্য

২০০ পাতার বেশি জমজমাট আরও সব লেখা

বিশ্বকাপের তারকাদের রঙিন পোস্টার

- ভারতীয় সময়ে কোন খেলা কখন, কোথায়

তারকাদের ফুটবল

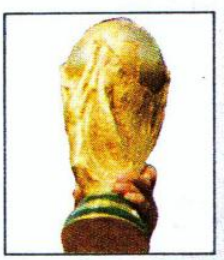

এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা কে কী বলছেন : লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত ডোরা, কৃশানু দে, বাইচুং ভুটিয়া, পি. কে. ব্যানার্জি, অমল দত্ত, মিঠুন চক্রবর্তী, কুমার শানু ও আরও অনেকে।

- 'কোয়ালিফাইং রাউন্ড'-এর প্রতিটি ম্যাচের বিস্তারিত ফলাফল
- বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক সংস্থা 'ফিফা'-র কাজকর্মের বিভিন্ন খুঁটিনাটি নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা
- বিশ্বকাপের ইতিহাস : গত ১৫টি বিশ্বকাপের নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য
- ফুটবল নিয়ে তিনটি দুর্দান্ত গল্প লিখেছেন **বিমল কর, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও দিব্যেন্দু পালিত**

সত্যজিৎ রায়

মহাকাশের

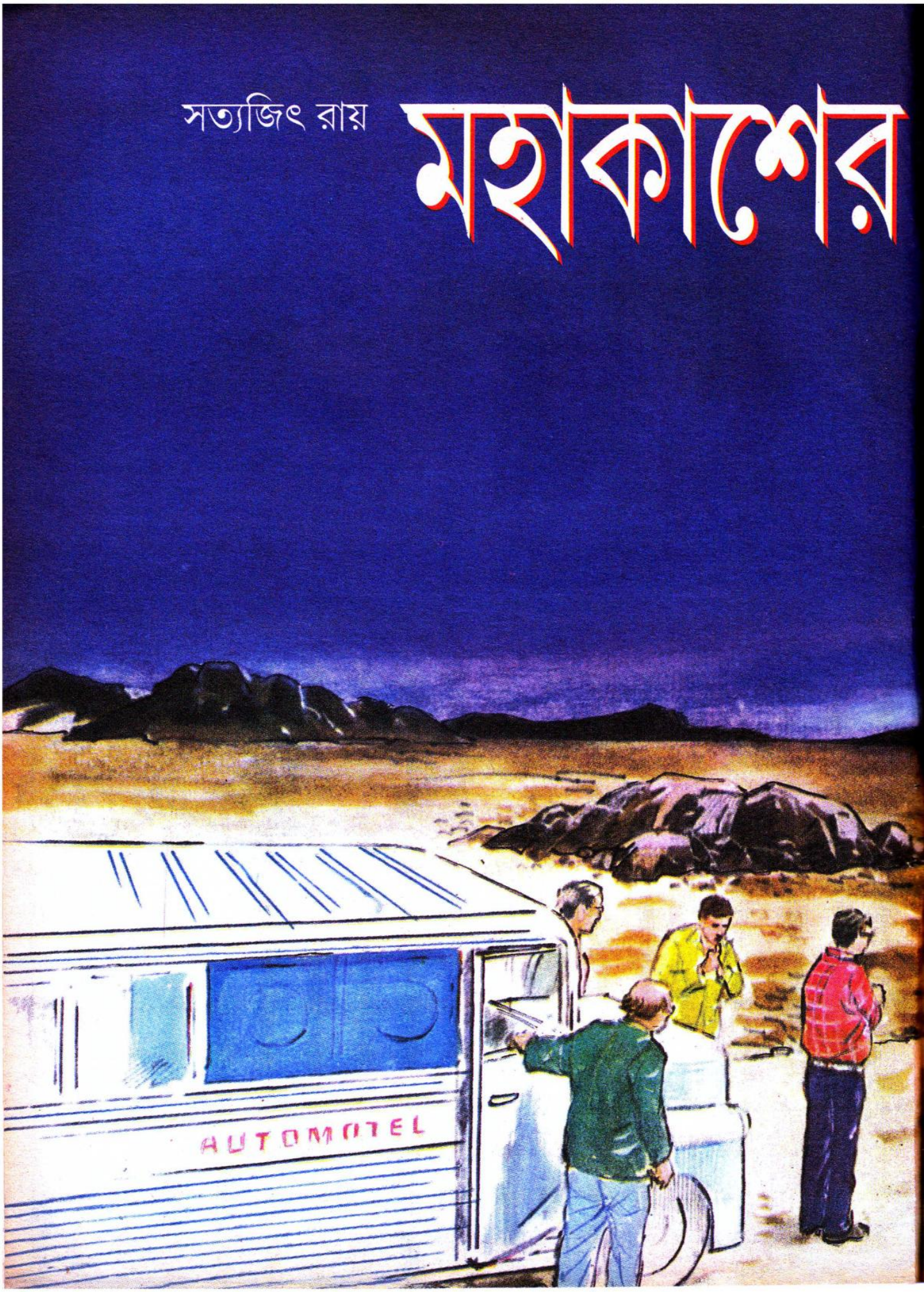

দূত

প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার

২২শে অক্টোবর

ব্রেন্টউড, ১৫ই অক্টোবর

প্রিয় শঙ্কু,

মনে হচ্ছে আমার বারো বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল পেতে চলেছি। খবরটা এখনো প্রচার করার সময় আসেনি, শুধু তোমাকেই জানাচ্ছি।

কাল রাত একটা সাঁইত্রিশে এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো একটা অংশ থেকে আমার সংকেতের উত্তর পেয়েছি। মৌলিক সংখ্যার সংকেতের উত্তর মৌলিক সংখ্যাতেই এসেছে ; সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ছায়াপথের ওই অংশে কোনো একটি গ্রহ বা উপগ্রহে এমন প্রাণী আছে যারা আমাদের গণিতের ভাষা বোঝে এবং যারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক।

তবে আশ্চর্য এই যে, পৃথিবী থেকে এই বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলের যে দূরত্ব তাতে বেতার তরঙ্গে সংকেত পৌঁছাতে লাগা উচিত দশ বছর। আমি প্রথম সংকেত পাঠাই আজ থেকে বারো বছর আগে। নিয়মমতো উত্তর আসতে লাগা উচিত ছিল আরো আট বছর। সেখানে মাত্র দু' বছর লাগল কেন ? তাহলে কি এই প্রাণী বেতার-তরঙ্গের গতির চেয়েও অনেক বেশি দ্রুত গতিতে সংকেত পাঠানর উপায় আবিষ্কার করেছে ? এরা কি তাহলে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত ?

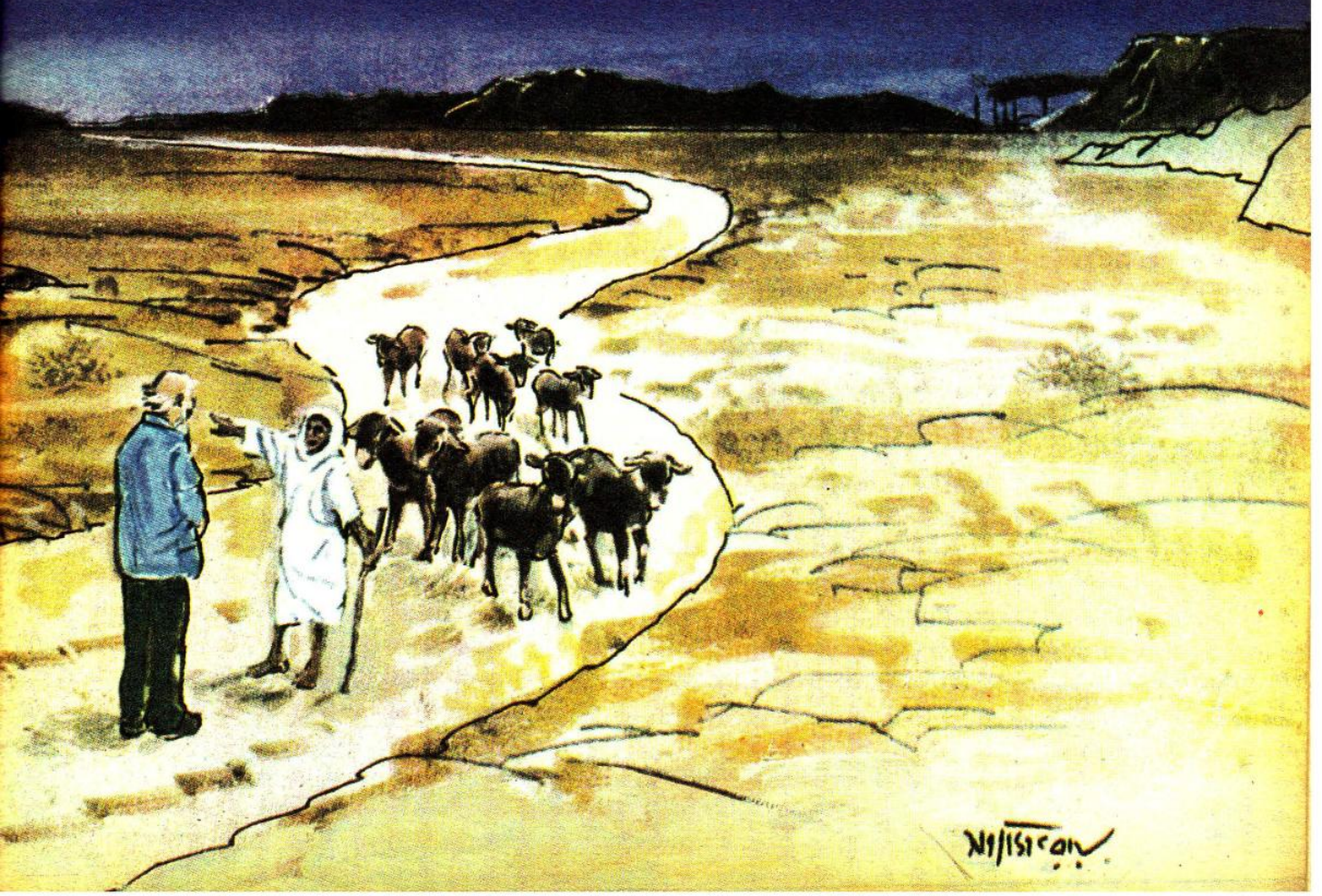

যাই হোক, এই নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমাকে খবরটা দিলাম কারণ আমার মতো তোমারও নিশ্চয়ই মিশরের সেই প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথাটা মনে পড়ছে।

আশা করি ভাল আছ। নতুন খবর পেলেই তোমাকে জানাব। শুভেচ্ছা নিও।

ফ্রানসিস

ইংলন্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রানসিস ফীল্ডিং হল আমার বাইশ বছরের বন্ধু। অন্য গ্রহে প্রাণী আছে কিনা, বহু চেষ্টায় তার কোনো ইঙ্গিত না পেয়ে বিশ্বের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক যখন প্রায় হাল ছাড়তে বসেছে, ফীল্ডিং তখনও একা তার নিজের তৈরি ৯৫ ফুট ডায়ামিটারের রিসীভার তার নিজের বাড়ির পিছনের জমিতে বসিয়ে এক নাগাড়ে বছরের পর বছর ছায়াপথের একটি বিশেষ অংশে ২১ সেন্টিমিটারে বেতার তরঙ্গে গাণিতিক সংকেত পাঠিয়ে চলেছে। আজ তার সফলতার ইঙ্গিত পেয়ে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

ফ্রানসিস যে প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথা তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে, সে বিষয় কিছু বলা দরকার।

প্রাচীন মিশরের একটানা সাড়ে তিন হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে অনেক রাজার উল্লেখ আছে, এবং এদের সমাধি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিৎরা অনেক আশ্চর্য জিনিস পেয়েছেন। মৃত্যুর পরে রাজার আত্মা যাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য কফিনবদ্ধ শবদেহের সঙ্গে ধনরত্ন পুঁথিপত্র পোশাক-পরিচ্ছদ বাসনকোসন ইত্যাদি বহু সামগ্রী পুরে দেওয়া হত সমাধির মধ্যে। এই সমাধির প্রবেশদ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেও, ভিতরের জিনিসপত্র অনেক সময়ই লুট হয়ে যেত। ১৯২২ সালে বালক-রাজা তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কার হবার পরে যখন দেখা গেল যে প্রবেশদ্বারের সীলমোহরটি অক্ষত রয়েছে, তখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। আজ কায়রো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায় কী আশ্চর্য সব জিনিস ছিল এই সমাধিতে।

গত মার্চ মাসে আমেরিকান ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন কায়রোতে বেড়াতে এসে খবর পান যে সেইদিনই সকালে স্থানীয় পুলিস দুটি চোর ধরেছে যাদের কাছে প্রাচীন মিশরের কিছু মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেছে। তাঁরা স্বীকার করেছে যে জিনিসগুলো এসেছে একটি মাস্তাবা বা সমাধি থেকে। নাইলের পূব পারে বেনি হাসানে একটি চুনা পাথরের টিলার গায়ে লুকোন ছিল এই মাস্তাবার প্রবেশপথ।

মর্গেনস্টার্ন তৎক্ষণাৎ মিশর সরকারের অনুমতি নিয়ে নিজের খরচে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল খাড়া করে এই মাস্তাবার ভিতরে খোঁড়ার কাজ শুরু করে দেয়। ধনরত্ন বিশেষ অবশিষ্ট না থাকলেও, একটি জিনিস পাওয়া যায় যেটা খুবই অদ্ভুত এবং মূল্যবান। সেটা হল একটা প্যাপাইরাসের দলিল।

প্যাপাইরাস গাছের আঁশ চিরে নিয়ে তাকে পানের তবকের মতো করে পিটিয়ে পাতলা করে কাগজের মতো ব্যবহার করত মিশরীয়রা। এতদিন যে-সব প্যাপাইরাস পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই রাজপ্রশস্তি, বা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা বা স্থানীয় উপকথা। কিন্তু এবারের এই প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় সেটা কতকগুলি দৈববাণী, যাকে ইংরাজিতে বলে ওর‍্যাক্‌ল্‌স। ফ্রান্সের দৈবজ্ঞ নস্ট্রাডামুসের ওর‍্যাক্‌ল্‌সের কথা অনেকেই জানে। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে পদ্যে লেখা এক হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলোই পরবর্তী কালে আশ্চর্যভাবে ফলে গেছে। লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড, ফরাসী বিপ্লবে ষোড়শ লুই-র গিলোটিনে মুণ্ডপাত, নেপোলিয়ন-হিটলারের উত্থান-পতন, এমন-কি হিরোশিমা ধ্বংসের কথা পর্যন্ত নস্ট্রাডামুস বলে গিয়েছিলেন।

মিশরের এই প্যাপাইরাসেও এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, কিন্তু সবগুলোই বিজ্ঞান সংক্রান্ত। হয়ত যাঁর সমাধি, তিনিই করেছেন এইসব ভবিষ্যদ্বাণী। যিনিই করে থাকুন, তাঁর গণনায় স্তম্ভিত হতে হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বলা হয়েছে বাষ্পযান আকাশযান টেলিফোন টেলিভিশন আবিষ্কারের কথা ; যান্ত্রিক মানুষের কথা বলা আছে ; কম্পিউটারের বর্ণনা আছে, এক্স-রে ইনফ্রা-রেড রে আল্‌ট্রা ভায়োলেট-রে'র কথা বলা আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যা বলা হয়েছে—এবং যেটা সবে বৈজ্ঞানিক মহল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে—সেটা হল এই যে সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে প্রাণী নেই। আমাদের সৌরজগতের বাইরে মহাকাশে আরো অসংখ্য সৌরজগৎ আছে যেখানে নাকি নানান গ্রহে নানারকম প্রাণী আছে, কিন্তু মানুষের মতো প্রাণী আছে কেবল আর একটিমাত্র গ্রহে। এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীর মানুষের চেয়ে নাকি অনেক বেশি উন্নত। শুধু তাই নয়, বহুকাল থেকে নাকি পাঁচ হাজার বছরে একবার করে এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, এবং পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেছে। প্যাপাইরাসের লেখক নিজেই নাকি এমন একটি গ্রহান্তরের মানুষের সামনে পড়েছিলেন, এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতার জন্য নাকি এই ভিন্‌গ্রহের মানুষই দায়ী।

এই আশ্চর্য প্যাপাইরাসটি মর্গেনস্টার্ন কায়রোর সংগ্রহশালার অধ্যক্ষকে বলে-কয়ে আদায় করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। গত মে মাসে লন্ডনে একটি বিশেষ বৈঠকে পৃথিবীর কয়েকজন বাছাই করা বৈজ্ঞানিকের সামনে মর্গেনস্টার্ন এই প্যাপাইরাসটি উপস্থিত করেন, এবং সে সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করেন বিখ্যাত মিশর-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এডওয়ার্ড থর্নিক্রফ্‌ট। জীর্ণ প্যাপাইরাসের তলার খানিকটা অংশ নেই। হয়ত সেখানে লেখকের নাম ছিল ; কিন্তু সেটা এখন আর জানার উপায় নেই। তবু, যেটুকু জানা গেছে তাও খুবই চমকপ্রদ। সন-তারিখের যা উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লেখকের সঙ্গে ভিন্‌গ্রহের প্রাণীর সাক্ষাৎ হয়েছিল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। ঠিক কবে এবং কোথায় আবার সেই গ্রহের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে সে খবরটা মনে হয় পুঁথির লুপ্ত অংশে ছিল, এবং তাই নিয়ে মর্গেনস্টার্ন গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

আমার সঙ্গে আমার জার্মান বৈজ্ঞানিক বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম ক্রোলও উপস্থিত ছিল এই সভায়। এমন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক আমি কমই দেখেছি। বক্তৃতার সময় আমার কানের

কাছে মুখ এনে সে যে কতবার 'হামবাগ, ফ্রড, ধাপ্পাবাজ' ইত্যাকার মন্তব্য করেছে তার হিসেব নেই। বক্তৃতার শেষে সে সরাসরি বলে বসল যে প্যাপাইরাসটা সে একবার হাতে নিয়ে দেখতে চায়। ক্রোলের যথেষ্ট খ্যাতি আছে বলেই বোধহয় মর্গেনস্টার্ন অপমান হজম করে তার অনুরোধ রক্ষা করে। আমিও দেখলাম প্যাপাইরাসটাকে খুব মন দিয়ে, কিন্তু সেটা জাল বলে মনে হল না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ফীল্ডিং যে গ্রহ থেকে তার বেতার-সংকেতের উত্তর পেয়েছে, প্যাপাইরাসে কি সেই গ্রহের প্রাণীর কথাই বলা হয়েছে ?

ব্যাপারটা আরো কিছু দূর না এগোলে বোঝার উপায় নেই।

২৬শে অক্টোবর

কাগজে আশ্চর্য খবর।

গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন আত্মহত্যা করেছে।

সে ইতিমধ্যে আবার কায়রোয় ফিরে গিয়েছিল ; কেন তা খবরে বলেনি। যেটা বলেছে সেটা হল এই—

কায়রোতে পৌঁছানর দুদিন পরেই সে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায় যে তার রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, কারণ ঘুম ভাঙলেই সে দেখতে পায় তার জানালায় একটা শকুনি বসে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। ম্যানেজার নাকি প্রথমে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে ফল ভালো হয়নি। মর্গেনস্টার্ন রেগে তার টুঁটি টিপে ধরেছিল। এদিকে সন্ত্রাস্ত অতিথি হিসেবে এহেন অবিশ্বাস্য অভিযোগ সত্ত্বেও মর্গেনস্টার্নের বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নিতে পারেনি ম্যানেজার। জানালাটা বন্ধ রাখার প্রস্তাব করাতে মর্গেনস্টার্ন বলেন যে হাঁপানির জন্য তিনি বন্ধ ঘরে শুতে পারেন না।

দুদিন অভিযোগ করার পর তৃতীয় দিন সকালে কফি নিয়ে রুমবয় মর্গেনস্টার্নের ঘরের বেল বারবার টিপে কোনো জবাব না পেয়ে শেষে মাস্টার কী দিয়ে দরজা খুলে দেখে ঘর খালি। ভদ্রলোকের স্যুটকেস রয়েছে, স্নানের ঘরে প্রসাধনের জিনিসপত্র রয়েছে, আর বেডসাইড টেবিলের উপর রয়েছে টিকিট লাগানো একটা ছোট্ট পার্সেল, আর একটা খোলা চিঠি। চিঠিতে লেখা শুধু একটি লাইন—'নেফদেৎ আমায় বাঁচতে দিল না।'

মিশরীয়রা সেই প্রাচীন যুগ থেকে নানারকম জন্তু জানোয়ার পাখি সরীসৃপকে দেব-দেবীরূপে কল্পনা করে পূজো করে এসেছে। শেয়াল কুকুর সিংহ প্যাঁচা সাপ বাজপাখি বেড়াল ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে। শকুনি ছিল তাদের কাছে নেফদেৎ দেবী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় মর্গেনস্টার্ন ভোর রাত্তিরে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় দ্বাররক্ষককে বেশ ভালো রকম বকশিস দিয়ে। পুলিস প্যাকেটটা খুলে দেখে তাতে কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা। সেটা থেকে বেরোয় মর্গেনস্টার্নের মহামূল্য রিস্টওয়াচ, যেটা সে পাঠাতে চেয়েছিল নিউ ইয়র্কে তার এক ভাইপোর কাছে।

এখানে বলা দরকার যে মিশরের প্রাচীন সমাধি খোঁড়ার শোচনীয় পরিণামের নজির এটাই প্রথম নয়। তুতানখামেনের সমাধি খননের ব্যাপারে যিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেই লর্ড কারনারভনকেও কিছুদিনের মধ্যেই ভারী অদ্ভুতভাবে মরতে হয়েছিল। কায়রোর এক হোটেলেই তার গালে এক মশা কামড়ায়। সেই কামড় থেকে সেপটিক ঘা, এবং তার ফলে রক্তদৌর্বল্য থেকে নিউমোনিয়া এবং মৃত্যু।

কারনারভনের মৃত্যু যে সময়ে ঘটে, ঠিক সেই একই সময়ে ইংল্যান্ডে হ্যাম্পশায়ারে কারনারভনের পোষা কুকুরটি বিনা রোগে অকস্মাৎ মারা যায়। এই দুই মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে এই সমাধির কাজের সঙ্গে জড়িত আরো আটজন পর পর মারা যায় এবং কারুর মৃত্যুই ঠিক স্বাভাবিক ছিল না।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে ব্রায়ান ডেক্সটার এখন কোথায় আছে! ডেক্সটার একজন তরুণ বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ফোটোগ্রাফার। সে মর্গেনস্টার্নের সঙ্গে ছিল এই সমাধি খননের ব্যাপারে। কথা ছিল কায়রোর কাজ শেষ হলে ও ভারতবর্ষে চলে আসবে। বছর তিনেক আগে একবার এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ; আমার চিঠিতেই ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ডেক্সটারকে কালিবঙ্গনে গিয়ে হারাপ্পা সভ্যতার নিদর্শনের কিছু ছবি তোলার অনুমতি দেয়। ও বলে রেখেছে এবার এলে গিরিডিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

২৮শে অক্টোবর

ফীল্ডিং-এর চিঠিতে চাঞ্চল্যকর খবর।

ছায়াপথ থেকে সংকেত এখন রীতিমত স্পষ্ট, এবং তা শুধু মৌলিক সংখ্যায় নয়।

ফীল্ডিং-এর দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহই হচ্ছে প্যাপাইরাসের গ্রহ। যেভাবে ঘন ঘন সংকেত আসছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পেরে এই নাম-না-জানা গ্রহের প্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠেছে, অনেক দিনের পুরোন বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যেমন হয়।

ফীল্ডিং-এর উত্তেজনা আমিও আমার শিরায় অনুভব করছি। গভীর আপশোষ হচ্ছে প্যাপাইরাসের ওই হারানো শেষাংশের জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহের প্রাণী আবার কবে পৃথিবীতে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তার ইঙ্গিত এই হারানো অংশে ছিল। কালই রাত্রে আমার বাগানে ডেক-চেয়ারে বসে ছিলাম অন্ধকারে, নিউটন আমার কোলে, আমার দৃষ্টি আকাশের দিকে। এমনিতেই অক্টোবরে উল্কাপাত হয় অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশি ; কাল দেড় ঘণ্টায় সতেরটা উল্কা দেখেছি, আর প্রতিবারই প্যাপাইরাসের গ্রহের কথা মনে হয়েছে।

৩০শে অক্টোবর

ফীল্ডিং-এর কাছ থেকে জরুরি টেলিগ্রাম—'পত্রপাঠ চলে এসো কায়রো—তোমার জন্য হোটেল কার্ণাকে ঘর বুক করা হয়ে গেছে।' আমি জানিয়ে দিয়েছি ৩রা নভেম্বর পৌঁছচ্ছি।

কিন্তু হঠাৎ কায়রো কেন ?

ঈশ্বর জানেন।

৪ঠা নভেম্বর

আমি কালই পৌঁছেছি, যদিও প্লেন ছিল তিন ঘণ্টা লেট। আমার মন বলছিল এয়ারপোর্টে এসে দেখব শুধু ফীল্ডিং নয়, ক্রোলও এসেছে ; কিন্তু সেই সঙ্গে যে আরেকজন থাকবে, সেটা ভাবতে পারিনি। ইনি হলেন ব্রায়ান ডেক্সটার। ব্রায়ানকে দেখেই বুঝলাম যে তার ওপর ভারতবর্ষের সূর্যের প্রভাব পড়েছে, কারণ তার এত তামাটে রঙ আগে কখনো দেখিনি।

ব্রায়ান এবারও কালিবঙ্গন গিয়েছিল, আর সেখানে থাকতেই মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সোজা লন্ডনে চলে আসে। আত্মহত্যার বিবরণ শুনে সে নাকি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, যদিও আমি জিগ্যেস করাতে বলল, অভিশাপ-টভিশাপে তার বিশ্বাস নেই। তার ধারণা মর্গেনস্টার্নের সানস্ট্রোক জাতীয় কোনো ব্যারামের সূত্রপাত হয়, এবং তার ফলে মাথাটা বিগড়ে যায়। ব্রায়ান নাকি বেনি হাসানের সমাধি খননের সময়ই লক্ষ্য করেছিল যে মর্গেনস্টার্ন রোদের তাপ একদম সহ্য করতে পারে না।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে কি সে সত্যিই উৎসাহী ছিল ?' ব্রায়ান বলল, 'অগাধ টাকা থাকলে অনেক লোক নানারকম শখকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। তাছাড়া খ্যাতির প্রতিও মর্গেনস্টার্নের একটা লোভ ছিল। শুধু বড়লোক হয়ে আর আজকাল আমেরিকায় বিশেষ কেউ নাম করতে পারে না। সবাই চায় একটা কোনো কীর্তি রেখে যেতে। হয়ত মর্গেনস্টার্ন চেয়েছিল এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান ফিনান্স করে সে

বেশ কিছুটা খ্যাতি লাভ করবে।'

আমি আরো কয়েকটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফীল্ডিং বাধা দিয়ে বলল বাকি কথা হোটেলে গিয়ে হবে।

লাঞ্চের পর কার্ণাক হোটেলের দোতলার খোলা বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে বাকি কথা হল। সামনে নীল নদ বয়ে চলেছে, টুরিস্টদের জন্য নানারকম বোট সাজানো রয়েছে জেটিতে, রাস্তায় দেশ-বিদেশের বিচিত্র লোকের ভীড়।

প্রথমেই ব্রায়ান তার ক্যামেরার ব্যাগ থেকে একটা বড় খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'দেখ ত জিনিসটা তোমার চেনা কি না।'

খুলে দেখি, আরে, এ যে সেই প্যাপাইরাসটার ফোটোগ্রাফ।

'জিনিসটা পাওয়া মাত্র এটার ছবি তুলে রেখেছিলাম,' বলল ব্রায়ান—'তুমি যে প্যাপাইরাসটা লন্ডনে দেখেছিলে সেটার সঙ্গে কোনো তফাৎ দেখছ কি?'

দেখছি বৈ কি?—ছবিটা হাতে নিতেই ত তফাৎটা লক্ষ্য করেছি। এটা সম্পূর্ণ প্যাপাইরাসটার ছবি, তলার অংশটুকুও বাদ নেই।

ব্রায়ানকে জিগ্যেস করাতে সে ব্যাপারটা বলল।—

'আসলে প্যাপাইরাসটার অবস্থা এমনিতেও ছিল বেশ জীর্ণ। পাঁচ হাজার বছর পাকানো অবস্থায় সমাধিকক্ষের এক কোণে পড়ে ছিল। এটা আমিই প্রথম পাই। আর পেয়ে প্রথমেই সাবধানে পাক খুলে মাটিতে ফেলে চারকোণে চারটে পাথর চাপা দিয়ে কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট ফোটো তুলে নিই। মর্গেনস্টার্ন এটা দেখেই বগলদাবা করে। আমি ওকে বলি সে যেন খুব সাবধানে জিনিসটা হ্যান্ডেল করে। মুখে হ্যাঁ বললেও বেশ বুঝতে পারি ও এসব জিনিসের মূল্য ঠিক বোঝে না।

'ও প্রথমেই যায় থর্নিক্রফ্‌টের কাছে। থর্নিক্রফ্‌ট লেখাটা পড়ে দেবার পর মর্গেনস্টার্ন সোজা চলে যায় কায়রো মিউজিয়ামের কিউরেটর মিঃ এব্রাহিমের কাছে। আমার মনে আছে সেদিন খুব ঝড় ছিল; বালিতে শহর অন্ধকার হয়ে

গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস তখনই প্যাপাইরাসের শেষ অংশটা খোয়া গেছে।'

'ওয়েল, শঙ্কু ?'

ক্রোল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, যদিও তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছি। ক্রোল হায়রোগ্লিফিক্সের ভাষা ভালো ভাবেই জানে, এবং বুঝতেই পারছি সে ইতিমধ্যে শেষ অংশটির মানে বার করে ফেলেছে, আর তাই এই উত্তেজনা।

আমি বললাম, 'এই অংশতে ত দেখছি দৈবজ্ঞের নাম রয়েছে—মেনেফ্রু। আর অন্য গ্রহ থেকে যারা আসবে, তারা কবে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তাও দেওয়া রয়েছে।'

ফীল্ডিং বলল, 'সেই জন্যেই তোমাকে টেলিগ্রাম করে আনালাম। অমাবস্যা ত আর দুদিন পরেই, আর দৈবজ্ঞ যদি সনে ভুল না করে থাকেন—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'এতে যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে তার থেকেই ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমি একবার হিসাব করে দেখেছিলাম, ছিয়াত্তর বছর পর পর যদি হ্যালির ধূমকেতু আসে, তাহলে আজ থেকে ঠিক পাঁচ হাজার বছর আগে একবার সেই ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছিল—অর্থাৎ ৩০২২ বি সি-তে।'

ক্রোল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, 'আমারও হিসেব তোমার সঙ্গে মিলছে। প্যাপাইরাসে বলছে দৈবজ্ঞের যখন অন্য গ্রহের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন আকাশে ধূমকেতু ছিল। সেটা ৩০২২ হওয়া এই জন্যই সম্ভব কারণ তখন ঈজিপ্টে মেনিসের রাজত্বকাল, আর সেটাকেই বলা হয় ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু। সব মিলে যাচ্ছে, শঙ্কু।'

ডেক্সটার বলল, 'কিন্তু এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে কি ? এক-আধ বছরও কি এদিক-ওদিক হতে পারে না ?'

ফীল্ডিং তার চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'আমার ধারণা, এতে কোনো ভুল নেই, কারণ আমি এখানে আসার আগের দিনই এপসাইলন ইন্ডি থেকে সংকেত পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে, এবং তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা হল এখান থেকে আন্দাজ দুশো কিলোমিটার পশ্চিমে।'

'তার মানে মরুভূমিতে ?' ডেক্সটার প্রশ্ন করল।

'সেটাই স্বাভাবিক নয় কি ?'

'কিন্তু কী ভাষায় পেলে এই সংকেত ?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'টেলিগ্রাফের ভাষা,' বলল ফীল্ডিং, 'মর্স।'

'তার মানে পৃথিবীর সঙ্গে তারা যোগ রেখে চলেছে এই গত পাঁচ হাজার বছর ?'

'সেটা আর আশ্চর্য কী, শঙ্কু। ভুলে যেও না তাদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।'

'তাহলে ত তারা ইংরেজিও জানতে পারে।'

'কিছুই আশ্চর্য নয়। তবে আমি ইংরেজ কিনা সেটা হয়ত তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, তাই তারা মর্স কোড ব্যবহার করেছে।'

'তাহলে আমাদের গন্তব্যস্থল হল কোথায় ?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'তারা ত আর এই হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না !'

ফীল্ডিং হেসে বলল, 'না, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমরা যাব বাওয়িতি— এখান থেকে দুশো ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। রাস্তা আছে, তবে তাকে হাইওয়ে বলা চলে না। অবিশ্যি তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ক্রোলের গাড়িটা ত তুমি দেখেছ।'

তা দেখেছি। এয়ারপোর্ট থেকে ক্রোলের গাড়িতেই এসেছি। বিচিত্র গাড়ি— যেন একটি ছোটখাটো চলন্ত হোটেল। সেই সঙ্গে মজবুতও বটে। 'অটোমোটেল' নামটা ক্রোলেরই দেওয়া।

'ডাঃ থর্নিক্রফ্‌টও আসছেন কাল সকালে,' বলল ফীল্ডিং, 'তিনিও হবেন আমাদের দলের একজন।'

এ খবরটা জানা ছিল না। তবে থর্নিক্রফ্‌টের আগ্রহের কারণটা স্পষ্ট। হাজার হোক তিনিই ত প্যাপাইরাসের পাঠোদ্ধার করেছেন।

'তোমার অ্যানাইহিলিনটা সঙ্গে এনেছ ত ?' ক্রোল জিগ্যেস করল।

আমি জানিয়ে দিলাম যে এ ধরনের অভিযানে সেটা সব সময়েই সঙ্গে থাকে। আমার তৈরি এই আশ্চর্য পিস্তলের কথা এরা সকলেই জানে। যত বড় এবং যত শক্তিশালী প্রাণীই হোক না কেন, তার দিকে তাগ করে এই পিস্তলের ঘোড়া টিপলেই সে প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবসুদ্ধু বার দশেক চরম সংকটের সামনে পড়ে আমাকে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। প্যাপাইরাসের বিবরণ থেকে এই ভিন্ গ্রহের প্রাণীকে হিংস্র বলে মনে হয় না, কিন্তু এবার যারা আসবে তাদের অভিপ্রায় যখন জানা নেই, তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলে ক্ষতি কী ?

আমরা চারজনে পরস্পরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রইলাম যেন আমাদের এই আসন্ন অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানে।

আমরা উঠে যে-যার ঘরে যাবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় দেখি হোটেলের ম্যানেজার মিঃ নাহুম আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এখানে বলে রাখি যে এই কার্ণাক হোটেল থেকেই মর্গেনস্টার্ন উধাও হয়েছেন, এবং এই মিঃ নাহুমকেই মর্গেনস্টার্নের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

নাহুম জানালেন যে মর্গেনস্টার্নের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কাজেই ধরে নিতে হয় মর্গেনস্টার্ন শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাইলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

'আর কোনো শকুনি-টকুনি এসে কোনো ঘরের জানলায় বসছে না ত ?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল ক্রোল।

জিভ কাটার অভ্যাস ইজিপ্সিয়দের থাকলে অবশ্যই মিঃ নাহুম জিহ্বা দংশন করতেন। তার বদলে তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'আপনাদের বলতে দ্বিধা নেই— আমাদের হোটেলের ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ কোনদিন শকুনি দেখেছে বলে শুনিনি। তবে বেড়াল-কুকুর যে এক-আধটা দেখা যাবে না তার ভরসা দিতে পারছি না, হে হে।'

আমরা ঠিক করেছি কাল লাঞ্চের পরেই রওনা দিয়ে দেব। কী আছে কপালে জানি না, তবে আমি মনে করি ইজিপ্টে আসার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। এখানে এসে দু মিনিট চুপ করে থাকলেই চারপাশের আধুনিক শহরের সব চিহ্ন মুছে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই প্রাচীন যুগের মিশর। ইমহোটেপ, আখেনাতন, খুফু, তুতানখামেনের দেশে এসে নামবে ছায়াপথের কোন্ এক অজ্ঞাত সৌর-জগতের প্রাণী ? ভাবতেও অবাক লাগে।

৫ই নভেম্বর

আজ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটো ঘটনা আমাদের সকলকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এখনো তার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

আমি ঠিক করেছিলাম আজ ভোর পাঁচটায় উঠে হোটেল থেকে বেরিয়ে নাইলের ধারে একটু ঘুরে আসব। গিরিডিতে রোজ ভোরে উশ্রীর ধারে বেড়ানোর অভ্যেসটা আমার বহুকালের।

ঘুম আমার আপনা থেকেই সাড়ে চারটেয় ভেঙে যায়। আজ কিন্তু ভাঙল স্বাভাবিক ভাবে নয়। আমার ঘরের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কাই এই নিদ্রাভঙ্গের কারণ।

ব্যস্তভাবে উঠে জাপানে উপহার পাওয়া বেগুনী কিমোনোটা চাপিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দেখি ডেক্সটার— তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দম ফেলছে যেন ম্যারাথন দৌড়ে এল।

'কী ব্যাপার ?'

'এ স্নেক—এ স্নেক ইন মাই রুম।'

কথাটা শেষ করে টলায়মান অবস্থায় ঘরে ঢুকে সে ধপ্ করে আমার খাটে বসে পড়ল।

আমি জানি ডেক্সটারের ঘর আমার তিনটে ঘর পরে। বাকি দুজন রয়েছে আমাদের উপরের তলায়, তাই সে আমার কাছেই

এসেছে।

ডেক্সটারকে আশ্বাস দিয়ে দৌড়ে প্যাসেজে গিয়ে হাজির হলাম।

মেঝেতে মিশরীয় নকশা-করা কার্পেট বিছানো সুদীর্ঘ প্যাসেজের এমাথা থেকে ওমাথায় একটি প্রাণীও নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ ঘড়ি বলছে আড়াইটে। যা করার আমাকেই করতে হবে।

সুটকেস থেকে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে ছুট দিলাম একশো ছিয়াত্তর নম্বর ঘরের দিকে। ডেক্সটারের কথায় যে পুরোপুরি বিশ্বাস হয়েছিল তা বলব না, তবে জরুরী অবস্থার জন্য তৈরি থাকা দরকার।

ঘরের দরজা হাট হয়ে আছে, ভিতরে ঢুকে বুঝলাম এ ঘর আর আমার ঘরের মধ্যে তফাত শুধু দেয়ালের ছবিতে।

বাঁয়ে চোখ ঘোরাতেই দেখলাম সাপটাকে। গোখুরো। খাটের পায়া বেয়ে মেঝের কার্পেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অর্ধেক দেহ খাটের উপর। ভারতীয় গোখুরোর মতো অত মারাত্মক না হলেও, বিষধর ত বটেই। প্রাচীন যুগে এই সাপকেও মিশরীয়রা পূজো করত দেবী হিসেবে।

আমার পিস্তলের সাহায্যে নিঃশব্দে নাগদেবীকে নিশ্চিহ্ন করে ফিরে এলাম আমার ঘরে।

ডেক্সটার এখনো কাবু। মেনেফুর রুষ্ট আত্মার অভিশাপে যে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেনি, এই গোখুরো তার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে

সে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমার মন অন্য কথা বলছে। তাই তরুণ ত্রস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদকে আমার তৈরি নার্ভিগারের এক ফোঁটা জলে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম।

তাতেও অবিশ্যি পুরোপুরি কাজ হল না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, তার ঘরের আর কোথাও কোনো সাপ নেই সেটা দেখিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

ম্যানেজারের সঙ্গে একটা তুলকালাম হয়ে যেত, কিন্তু সাপটা কোথায় গেল জিগ্যেস করলে উত্তর দেওয়া মুশকিল হত বলে সেটা আর হল না। যেহেতু আজই আমরা হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটালাম না।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল হোটেলের পিরামিড রুমে, ব্রেকফাস্টের সময়। থর্নিক্রফ্‌টের প্লেন এসে পৌঁছাবে ভোর ছটায়, সুতরাং তার হোটেলে পৌঁছে যাওয়া উচিত সাড়ে সাতটার মধ্যে। আটটায়, তখনও আমাদের প্রাতরাশ শেষ হয়নি, ম্যানেজার স্বয়ং এসে খবর দিলেন যে থর্নিক্রফ্‌ট এসে পৌঁছেছেন ঠিকই, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটি

আঘাত পেয়ে থর্নিক্রফ্‌ট সংজ্ঞা হারান। দুজন সুইস্ টুরিস্ট পুলিশের সাহায্যে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে। ব্যাপারটা রাহাজানি তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তিনশো পাউন্ড সমেত থর্নিক্রফ্‌টের ওয়লেটটি লোপ পেয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে আঘাত গুরুতর হয়নি। ভয় ছিল থর্নিক্রফ্‌টকে হয়ত দল থেকে বাদ দিতে হবে, কিন্তু প্রস্তাবটা উনি কানেই নিলেন না। বললেন ওঁর যে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তার জন্য উনি একরকম প্রস্তুতই ছিলেন। কারণ জিগ্যেস করাতে বললেন, 'জানি তোমাদের যুক্তিবাদী মন এসব মানতে চায় না আমি কিন্তু অভিশাপে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তোমাদের যদি আমার মতো পড়াশুনা থাকত, তাহলে তোমরাও আমার সঙ্গে একমত হতে।'

৫ই নভেম্বর, বিকেল পৌনে তিনটে

আমরা আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা লিখে রাখছি।

মিনিট পনের আগে মিঃ নাহুম একটি আজব জিনিস এনে দেখালেন আমাকে।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পকেট ডায়রি। বোঝাই যায় সেটা বেশ কিছুকাল জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। ভিতরে যা লেখা ছিল তা সব ধুয়ে-মুছে গেছে ; ছাপা অংশগুলোও আর পড়া যায় না। শুধু একটা কারণে জিনিসটার মালিকানা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না ; সেটা হল ডায়রির ভিতরে পাতার সঙ্গে জেম ক্লিপ দিয়ে আটকানো একটা ফোটোগ্রাফ। বিবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, যার ফোটো তাকে চিনতে অসুবিধা হয় না। লন্ডনের সেই সভায় এনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ইনি মর্গেনস্টার্নের স্ত্রী মিরিয়াম। কায়রো থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে নাইলের ধারে একটি জেলের বাড়ি থেকে পুলিস এই ডায়রিটা উদ্ধার করেছে। জেলের একটি সাত বছরের ছেলে নদীর ধারে কাদার মধ্যে এটাকে পায়।

মর্গেনস্টার্ন যতই বেআক্কেলি করে থাকুক না কেন, এই ডায়রিটা দেখে তার জন্য কিছুটা অনুকম্পা বোধ না করে পারলাম না।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। নিশ্চয়ই ফীল্ডিং।

৫ই নভেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

বাওয়িতি যাবার পথে কায়রো থেকে তিরাশি কিলোমিটার দক্ষিণে অল্ ফাইয়ুমের একটা সরাইখানায় বসে কফি আর আখরোট খাচ্ছি আমরা পাঁচজনে।

থর্নিক্রফ্‌ট অনেকটা সুস্থ। ডেক্সটার চুপ মেরে গেছে। তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, এবং তাকে বলা হয়েছে সে যেন আমাদের ছেড়ে কোথাও না যায়। ক্রোল তার ক্যামেরার সরঞ্জাম সাফ করছে। তিনটে নতুন মডেলের লাইকা। তার একটায় বিরাট টেলিফোটো লেন্স। মহাকাশযানের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা সে ক্যামেরায় তুলে রাখবে। কয়েক বছর থেকে 'আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট' বা 'অনির্দিষ্ট উড়ন্ত বস্তু' নিয়ে যে পৃথিবীর বেশ কিছু লোক মাতামাতি করছে, তাদের সম্বন্ধে ক্রোলের অবজ্ঞার শেষ নেই। বলল, 'এই সব লোকের তোলা বহু ছবি পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে, কিন্তু ধাপ্পাটা ধরা পড়ে এতেই, যে সব ছবিতেই উড়ন্ত বস্তুটিকে দেখান হয় একটি চাকতির মতো। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? অন্য গ্রহের মহাকাশযান হলেই কি তার চেহারা চাকতির মতো হবে ?'

ফীল্ডিং আমাদের দিকে চোখ টিপে প্রশ্ন করল, 'ধরো যদি আমাদের এই মহাকাশযানটিও চাকতির মতো দেখতে হয় ?'

'তাহলে সমস্ত সরঞ্জাম সমেত আমার এই তিনটে ক্যামেরাই নাইলের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেব,' বলল ক্রোল, 'চাকতি দেখার প্রত্যাশায় আসিনি এই বালি আর পাথরের দেশে।'

একটা চিন্তা কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে, সেটা আর না বলে পারলাম না।—

'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যে এই পাঁচ হাজার বছরের হিসেবে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে বেশ কয়েকটা আশ্চর্য তথ্য বেরিয়ে পড়ে ? পাঁচ হাজার বছর আগে ইজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু সে ত দেখেইছি। আরো পাঁচ হাজার পিছোলে দেখছি মানুষ প্রথম কৃষিকার্য শুরু করেছে, নিজের চেষ্টায় ফসল উৎপাদন করছে। আরো পাঁচ হাজার পিছিয়ে গেলে দেখছি মানুষ প্রথম হাড় ও হাতির দাঁতের হাতিয়ার, বর্শার ফলক, মাছের বঁড়শী ইত্যাদি তৈরি করছে, আবার সেই সঙ্গে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকছে। ত্রিশ হাজার বছর আগে দেখছি মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি বদলে গিয়ে আজকের মানুষের মতো হচ্ছে। ... পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অধ্যায় আজও আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই পাঁচের হিসেবে যতটুকু ধরা পড়ছে সেটা আশ্চর্য নয় কি ?'

আমার কথায় সবাই সায় দিল।

ক্রোল বলল, 'হয়ত এদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ আছে—একেবারে মানুষের আবির্ভাব থেকে শুরু করে ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু অবধি।'

'তা তো থাকতেই পারে' বলল ফীল্ডিং।— 'এরা যদি জিগ্যেস করে আমরা কী চাই, তাহলে ওই দলিলের কথাটাই বলব। ওটা বাগাতে পারলে আর কোনো কিছুর দরকার আছে কি ?'

কফি আর আখরোটের দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

আজ অমাবস্যা।

বাকি পথটা আকাশের দিকে চোখ রেখে চলতে হবে।

৬ই নভেম্বর, সকাল সাড়ে ছ'টা

বিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখায় আমার অবাধ গতি বলে আমি নিজেকে সব সময় বৈজ্ঞানিক বলেই বলে এসেছি, কোনো একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞতার দাবি করিনি। আমাদের দলের বাকি চারজনেই বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে পড়ে, যদিও বয়স, অভিজ্ঞতা, কীর্তি বা খ্যাতিতে সকলে সমান নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, ফীল্ডিং, ক্রোল, থর্নিক্রফ্‌ট, ডেক্সটার, আমি—এদের কারুর মধ্যেই এখন আর কোনো তারতম্য ধরা পড়ছে না।

মহাসাগরের তুলনায় টলির নালা আর গঙ্গার মধ্যে খুব একটা তফাৎ আছে কি ?

কালকের অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলো পরপর গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

অল্ ফাইয়ুমের সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে রুক্ষ মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে মিনিট দশেক চলার পরেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে, যেটার বিষয় বলার আগে ক্রোলের অটোমোটেলের ভিতরটা কিরকম সেটা একটু বলা দরকার।

সামনে ড্রাইভারের পাশে দুজনের বসার জায়গা। তার ঠিক পিছনেই একটা সরু প্যাসেজের একদিকে একটা বাথরুম ও একটা স্টোররুম, আর অন্যদিকে একটা কিচেন ও একটা প্যানট্রি। প্যাসেজ থেকে বেরিয়েই দুদিকে দুটো করে বাঙ্ক—আপার ও লোয়ার। একজন অতিরিক্ত লোক থাকলে সে অনায়াসে দুদিকের বাঙ্কের মাঝখানে মেঝেতে বিছানা পেতে শুতে পারে।

গাড়ি চালাচ্ছিল ক্রোল, আর আমি বসে ছিলাম তার পাশে। পিছনে, লোয়ার বাঙ্কের একটায় বসে ছিল থর্নিক্রফ্ট, আরেকটায় ফীল্ডিং আর ডেক্সটার।

আমরা যখন বেরিয়েছি, তখন পৌনে সাতটা। আকাশে তখনও আলো রয়েছে। পথের দুধারে বালি আর পাথর। জায়গাটা মোটামুটি সমতল হলেও মাঝে মাঝে চুনা পাথরের টিলা বা টিলার সমষ্টি চোখে পড়ছে, তার মধ্যে এক-একটা বেশ উঁচু।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে মাঝে মাঝে আমাদের হোটেলের ম্যানেজার মিঃ নাহুমের মুখটা মনে পড়ছে, আর মনটা খচ্ খচ্ করে উঠছে। ভদ্রলোকের অতি-অমায়িক আচরণটা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে—যেন তিনি কোনো একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আকাশে সবে দু-একটা তারা দেখা দিতে শুরু করেছে, এমন সময় একটা আর্তনাদ, আর তার পরমুহূর্তেই একটা বিস্ফোরণের শব্দে স্টিয়ারিং-এ ক্রোলের হাতটা কেঁপে গিয়ে গাড়িটা প্রায় রাস্তার ধারে একটা খানায় পড়ছিল।

দুটো শব্দই এসেছে আমাদের গাড়ির পিছন দিক থেকে।

জায়গা ছেড়ে রুদ্ধশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে পিছনে এসে দেখি থর্নিক্রফ্টের হাতে রিভলভার, ডেক্সটার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখ করে মেঝের দিকে চেয়ে আছে, আর ফীল্ডিং যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে হতভম্বের মতো বসে আছে, তার চশমার কাচে কোনো তরল পদার্থের ছিটে লেগে তাকে যেন সাময়িকভাবে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ডেক্সটারের দৃষ্টি যেখানে, সেখানে মাথা থেঁৎলানো অবস্থায় পড়ে আছে আরেকটি গোখুরো। এর জাত কালকের গোখুরোর থেকে আলাদা। ইনিও মিশরের অধিবাসী। এঁর নাম স্পিটিং কোব্রা। ইনি ছোবল না মেরে শিকারের চোখের দিকে তাগ করে বিষের থুতু দাগেন। এতে মৃত্যু না হলেও অন্ধত্ব অবধারিত। ফীল্ডিং বেঁচে গেছে তার চশমার জন্য। আর সাপবাবাজী মরেছেন থর্নিক্রফ্টের সঙ্গে হাতিয়ার ছিল বলে।

অটোমোটেল থামিয়ে ফীল্ডিং-এর পিছনে কিছুটা সময় দিতে হলে। বিষের ছিটে চশমার কাচের তলা দিয়ে বাঁ চোখের কোলে লেগেছিল সেখানে আমার মিরাকিউরল অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দিলাম।

ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অভিশাপ-টভিশাপ নয়; কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে। আমরা যখন সরাইখানায় বসে কফি খাচ্ছিলাম সেই সময় গাড়ির জানালা দিয়ে সাপটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে এই কাজটা করেছে, সে নিশ্চয় কায়রো থেকেই এসেছে।

আবার যখন রওনা দিলাম তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাওয়িতি এখান থেকে আরো একশো কিলোমিটার। ম্যাপে তার পরে আর কোনো রাস্তার ইঙ্গিত নেই, তবে মোটামুটি সমতল জমি পেলে বালি পাথর অগ্রাহ্য করে এ গাড়ি এগিয়ে চলবে যদি সেটার প্রয়োজন হয়।

মিনিট দশেক চলার পর পথে একই সঙ্গে মানুষ ও জানোয়ারের সাক্ষাৎ মিলল।

একটি বছর পনেরর ছেলে, হাতে লাঠি, এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে আমাদেরই দিকে, তার পিছনে এক পাল গাধা।

আমাদের গাড়িটা দেখে হাঁটার গতি কমিয়ে হাত দুটোকে মাথার উপরে তুলে ঝাঁকাতে শুরু করল ছেলেটা।

'এস্টাপ্, এস্টাপ্, সাহিব। এস্টাপ্।'

ক্রোল বাধ্য হয়েই গাড়ি থামাল, কারণ পথ বন্ধ।

ব্যাপারটা কী ? হেডলাইটের আলোতে ছেলেটির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, গাধাগুলোও যেন কেমন অস্থির।

হাতছানি দিয়ে আমাদের বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করাতে আমি থামলাম। ছেলেটি দৌড়ে এল আমার দিকে।

'পিরমিট, সাহিব, পিরমিট।'

ছেলেটি যে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত সেটা তার ঘন ঘন নিশ্বাস আর চোখের চাহনি থেকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু এখানে পিরামিড কোথায় ?

জিগ্যেস করাতে সে সামনে বাঁয়ে দেখিয়ে দিল।

'ওগুলো ত পাহাড়—চুনোপাথরের পাহাড়। ওখানে পিরামিড কোথায় ?'

ছেলেটি তবুও বার বার ওই দিকেই দেখায়।

'তার মানে ওগুলোর পিছনে ?' ক্রোল জিগ্যেস করল। ছেলেটি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল—হ্যাঁ, ওই পাহাড়গুলোর পিছনে।

আমি ক্রোলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম। ইতিমধ্যে বাকি তিনজনও এসে জুটেছে। তাদের বললাম ব্যাপারটা। ফীল্ডিং বলল, 'আস্ক হিম হাউ ফার।'

জিগ্যেস করাতে ছেলেটি আবার বলল টিলাগুলোর পিছনে। কত দূর সেটা জিগ্যেস করে লাভ নেই, কারণ আমি দেখেছি পৃথিবীর সব দেশেই অশিক্ষিত চাষাভুষোদের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা থাকে না। অর্থাৎ পিরামিড এখান থেকে দু' কিলোমিটারও হতে পারে, আবার বিশ কিলোমিটারও হতে পারে।

'হিয়ার'—থর্নিক্রফ্ট পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার

করে ছেলেটার হাতে দিয়ে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিল—এবার তুমি প্রস্থান কর।

ছেলেটি মহা উল্লাসে পিরমিট পিরমিট করতে করতে গর্দভবাহিনী সমেত যে পথে যাচ্ছিল সে পথেই চলে গেল।

আমরা আবার রওনা দিলাম। আকাশে আলোকবিন্দুর সংখ্যা বাড়ছে, তবে চলমান বিন্দু এখনো কোনো চোখে পড়েনি। আমি জানি পিছনের কামরার তিনজনই জানালায় চোখ লাগিয়ে বসে আছে, বেচারা ক্রোলই শুধু রাস্তা থেকে চোখ তুলতে পারছে না।

মিনিট তিনেক যাবার পরই বাঁয়ে চোখ পড়তে দেখলাম, ছেলেটা খুব ভুল বলেনি।

টিলার আড়াল সরে যাওয়াতে সত্যিই একটা পিরামিড বেরিয়ে পড়েছে। সেটা কত দূরে বা কত বড় তা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু আকৃতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। লাইমস্টোনের রুক্ষ স্তূপগুলোর পাশে ওটা একটা পিরামিডই বটে।

ঈজিপ্টের সব জায়গা দেখা না থাকলেও এটুকু জানি যে এখানে পিরামিড থাকার কথা নয়, আর ভুঁইফোঁড়ের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠাটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ক্রোলই বলল যে রাস্তা খারাপ হোক না কেন, একবার কাছে গিয়ে জিনিসটা দেখে আসা দরকার। মহাকাশযান সত্যিই যদি আজ রাত্রেই এসে নামে, তাহলে তার সময় আছে এখনো প্রায় আট ঘণ্টা। আর, আকাশযান এলে আকাশে তার আলো ত দেখা যাবেই, কাজেই কোনো চিন্তা নেই।

অতি সন্তর্পণে বালি আর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর দিয়ে অটোমোটেল এগিয়ে চলল পিরামিডের দিকে।

শ'খানেক মিটার যাবার পরই বুঝতে পারলাম যে মিশরের বিখ্যাত সমাধিসৌধগুলির তুলনায় এ পিরামিড খুবই ছোট। এর উচ্চতা ত্রিশ ফুটের বেশি নয়।

আরো খানিকটা কাছে যেতে বুঝলাম পিরামিডটা পাথরের তৈরি নয়, কোনো ধাতুর তৈরি। ক্রোলের গাড়ির হেডলাইট পড়ে পিরামিডের গা থেকে একটা তামাটে আলো প্রতিফলিত হয়ে বাঁয়ের টিলাগুলোর উপর পড়ছে।

ক্রোল গাড়ি থামিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। আমরা পাঁচজন নামলাম।

ফীল্ডিং এগোতে শুরু করেছে পিরামিডটার দিকে।

আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

ক্রোল আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'কীপ ইওর হ্যান্ড অন ইওর গান। দিস্ মে বি আওয়ার স্পেসশিপ।'

আমারও অবিশ্যি সেই কথাই মনে হয়েছে। গাড়ির ভিতর ছিলাম, তাই আকাশের সব অংশে চোখ রাখতে পারিনি। এই ফাঁকে কখন ল্যান্ড করে বসে আছে কে জানে।

সামনে ফীল্ডিং থেমে হাত তুলেছে। বুঝতে পারলাম কেন। শরীরে একটা উত্তাপ অনুভব করছি। সেটা স্পেসশিপটা থেকেই বেরোচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই নৈঃশব্দ্য কেন?

আলো নেই কেন?

নামবার কোনো শব্দ পাইনি কেন?

আর উত্তাপের কারণ কি এই, যে এরা আমাদের কাছে আসতে দিতে চায় না?

কিন্তু না, তা তো নয়। উত্তাপ কমে আসছে দ্রুত বেগে।

আমরা আবার পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম পিরামিডের দিকে। মাথার উপরে আকাশ জুড়ে ছায়াপথ দেখা দিয়েছে। মরু অঞ্চলের রাতের আকাশ আমার চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু।

'ওয়ান—থ্রী—সেভ্ন— ইলেভ্ন— সেভ্নটীন— টোয়েন্টি থ্রী ...'

ফীল্ডিং মৌলিক সংখ্যা আওড়াতে শুরু করেছে। অবাক হয়ে দেখলাম পিরামিডের গায়ে অসংখ্য আলোকবিন্দুর আবির্ভাব হচ্ছে। ওগুলো আসলে ছিদ্র—স্পেসশিপের ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছে, আর সেই আলো দেখা যাচ্ছে পিরামিডের গায়ে ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে।

'ফর্টি ওয়ান—ফর্টি সেভ্ন—ফিফ্‌টি থ্রী—ফিফ্‌টি নাইন...'

এটা মানুষেরই কণ্ঠস্বর, তবে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কারুর নয়। এর উৎস ওই পিরামিড।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে ব্যাপারটা দেখছি, শুনছি, আর উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।

এবার কথা শুরু হল।—

'পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।'

ফীল্ডিং তার ক্যাসেট রেকর্ডার চালু করে দিয়েছে। ডেক্সটার ও ক্রোলের হাতে ক্যামেরা। কিন্তু এখনো ছবি তোলার মতো কিছু ঘটেনি।

আবার কথা। নিখুঁত ইংরিজি, নিখাদ উচ্চারণ, নিটোল কণ্ঠস্বর।

'তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব আমরা জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে। আমরা তখনই জানতে পারি যে তোমাদের গ্রহ ও আমাদের গ্রহের মধ্যে কোনো প্রাকৃতিক প্রভেদ নেই। এই তথ্য আবিষ্কার করার পর তখনই আমরা প্রথম তোমাদের গ্রহে আসি, এবং সেই থেকে প্রতি পাঁচ হাজার বছর এসেছি। প্রত্যেকবারই এসেছি একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা হল পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে কিছুদূর এগিয়ে দিতে সাহায্য করা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে আমাদের একটি পর্যবেক্ষণপোত এই পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছে। আমরা যখনই এখানে আসি, তখন পৃথিবীর অবস্থা জেনেই আসি। আমরা অনিষ্ট করতে আসি না। আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল মানুষের কতকগুলো সমস্যার সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে আবার ফিরে যাই। আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো, সেই মানুষ আমাদেরই সৃষ্টি, সেই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গড়নও আমাদেরই সৃষ্টি। মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই, যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান—পৃথিবীতে এসবের গোড়াপত্তন আমরাই করেছি, স্থাপত্যের অনেক সূত্র

আমরাই দিয়েছি।

'এই শিক্ষা মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়েছে তার উপর আমাদের কোনো হাত নেই। অগ্রগতির কিছু সূত্র নির্দেশ করার বেশি কিছু করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করিনি। মানুষকে আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্য বিস্তার শেখাইনি, শ্রেণীভেদ শেখাইনি, কুসংস্কার শেখাইনি। এসবই তোমাদের মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে, তার কারণই হল মানুষ নিঃস্বার্থ হতে শেখেনি। যদি শিখত, তাহলে মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারত। আজ আমরা তোমাদের হাতে যা তুলে দিতে এসেছি, তার সাহায্যে মানবজাতির আয়ু কিছুটা বাড়তে পারে। সেটা কী সেটা বলার আগে আমরা জানতে চাই তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা।'

'আছে।'—চেঁচিয়ে উঠল ক্রোল।

'করো প্রশ্ন।'

'তোমরা মানুষেরই মতো দেখতে কিনা সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে,' বলল ক্রোল। 'তোমাদের গ্রহের আবহাওয়া যদি পৃথিবীর মতোই হয়, তাহলে তোমাদের একজনের বাইরে বেরিয়ে আসতে কোনো বাধা নেই নিশ্চয়ই।'

ক্রোল তার ক্যামেরা নিয়ে রেডি।

উত্তর এল—

'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'—ক্রোলের অবাক প্রশ্ন।

'কারণ এই মহাকাশযানে কোনো প্রাণী নেই।'

আমরা পাঁচজনেই স্তম্ভিত।

'প্রাণী নেই?' ফীল্ডিং প্রশ্ন করল, 'তার মানে কি—?'

'কারণ বলছি। একই বছরের মধ্যে একটি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও একটি বিশাল উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহ থেকে প্রাণী লোপ পায়। অবশিষ্ট আছে কয়েকটি গবেষণাগার ও কয়েকটি যন্ত্র—যার মধ্যে একটি হল এই মহাকাশযান। দুর্যোগের দশ বছর আগে, দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা পূর্ব-পরিকল্পিত পৃথিবী-অভিযানের সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। এই অভিযান সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের নির্দেশে। আমি নিজে যন্ত্র। এই আমাদের শেষ অভিযান।'

এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

'তোমাদের এই শেষ অভিযানের উদ্দেশ্য কী জানতে পারি?'

'বলছি শোন,' উত্তর এল পিরামিডের ভিতর থেকে।—'তোমাদের চারটি সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এক—ইচ্ছা মতো আবহাওয়া বদলানো—যাতে খরা বা বন্যা কোনটাই মানুষের ক্ষতি না করতে পারে। দুই—শহরের দূষিত বায়ুকে শুদ্ধ করার উপায়। তিন—বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে সূর্যের রশ্মিকে যৎসামান্য ব্যয়ে মানুষের ব্যাপক কাজে লাগানোর উপায়; এবং চার—সমুদ্রগর্ভে মানুষের বসবাস ও খাদ্যোৎপাদনের উপায়। যে হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর পাঁচশো বছর পরে শুক্‌নো ডাঙায় আর মানুষ বসবাস করতে পারবে না। ... এই চারটি সূত্র ছাড়াও, শুধু মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের বিবরণ আমরা দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।'

'সূত্র এবং বিবরণ কি লিখিতভাবে রয়েছে?' প্রশ্ন করল ফীল্ডিং।

'হ্যাঁ। তবে লেখার ব্যাপারে মিনিয়েচারাইজেশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাত বছর আগে আমাদের গ্রহে দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আশা করি এই ক' বছরে মিনিয়েচারাইজেশনে তোমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ?'

'হয়েছি বই-কি।' বলে উঠল ক্রোল। 'গণিতের জটিল অঙ্কের জন্য আমরা এখন যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি, তা একটা মানুষের হাতের তেলোর চেয়ে বড় নয়।'

'বেশ। এবার লক্ষ্য কর, মহাকাশযানের গায়ে একটি দরজা খুলে যাচ্ছে।'

দেখলাম, জমি থেকে মিটার খানেক উপরে পিরামিডের দেয়ালে একটা ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারের আবির্ভাব হল।

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বলে চলল—

'মহাকাশযানের ভিতরে একটি টেবিল ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। সেই টেবিলের উপর একটি স্বচ্ছ আচ্ছাদনের নিচে যে বস্তুটি রয়েছে, তাতেই পাওয়া যাবে চারটি সমস্যার সমাধান ও পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস। তোমাদের মধ্যে থেকে যে-কোনো একজন প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে আচ্ছাদন তুলে বস্তুটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র মহাকাশযান ফিরতি পথে রওনা দেবে। তবে মনে রেখো, সমাধানগুলি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য; এই বস্তুটি যদি কোনো স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে, তাহলে—'

কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

কারণ কথার মাঝখানেই চোখের পলকে আমাদের সকলের অজান্তে অন্ধকার থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এসে তীরবেগে মহাকাশযানে প্রবেশ করে, আবার তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

পর মুহূর্তে দেখলাম, ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গগনভেদী হাহাকারের মতো শব্দ করে পিরামিড মিশরের মাটি ছেড়ে শূন্যে উত্থিত হল।

আমরা পাঁচ হতভম্ব অভিযাত্রী অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম একটি চতুষ্কোণ জ্যোতি ছায়াপথের অগণিত নক্ষত্রের ভীড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দে আমরা সকলে আবার সম্বিত ফিরে পেলাম।

গাড়িটা আমাদের না। শুনে মনে হচ্ছে জীপ, এবং সেটা রওনা দিয়ে দিয়েছে।

'কাম অ্যালং।'—চাবুকের মতো আদেশ এল ক্রোলের কাছ থেকে। সে তার অটোমোটেলের দিকে ছুটেছে।

এক মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়িও ছুটে চলল রুক্ষ মরুভূমির উপর দিয়ে।

কোন্ দিকে গেল জীপ? রাস্তায় গিয়ে ত উঠতেই হবে

তাকে।

শেষ পর্যন্ত একটা কানফাটা সংঘর্ষের শব্দ ও ক্রোলের গাড়ির তীব্র হেডলাইট জীপটার হদিস দিয়ে দিল। হেডলাইট না জ্বালিয়েই মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছিল সেটা, আর তার ফলেই জমিতে পড়ে থাকা প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে সজোর সশব্দ সংঘাত।

আর তাড়া নেই, তাই সাবধানে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রোল তার গাড়িটাকে জীপের দশ হাত দূরে দাঁড় করাল। আমরা পাঁচজনে নেমে এগিয়ে গেলাম।

জীপের দফা শেষ। সেটা উল্টে কাত হয়ে পড়ে আছে বালি ও পাথরের মধ্যে, আর তার পাশে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে দুজন লোক। একজন স্থানীয়, সম্ভবত গাড়ির চালক, আর অন্যজন—থর্নিক্রফ্‌টের টর্চের আলোয় চেনা গেল তাকে—হলেন মার্কিন ধনকুবের ও. শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন।

সাপ ও শকুনের রহস্য মিটে গেল। কার্ণাক হোটেলের ম্যানেজার নাহুমের সঙ্গে এনার ষড় ছিল নিঃসন্দেহে। স্বার্থান্বেষণের পথে যাতে কোনো বাধা না আসে, তাই আমাদের হটাবার জন্য এত তোড়জোড়। এটা বেশ বুঝতে পারছি যে মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু হয়েছে প্রাচীন মিশরের কোনো দেবতার অভিশাপে নয়; তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছে ছায়াপথের একটি বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত একটি বিশেষ গ্রহ।

'লোকটার পকেটে ওটা কী?'

ক্রোল এগিয়ে গিয়ে মর্গেনস্টার্নের কোটের পকেট থেকে একটি জীর্ণ কাগজের টুকরো টেনে বার করল। সেটা যে মেনেফ্রুর প্যাপাইরাসের ছেঁড়া অংশ সেটা আর বলে দিতে হয় না।

কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি।

মর্গেনস্টার্নের মুঠো করা ডান হাতটা বালির উপর পড়ে আছে, আর সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা নীল আভা বেরিয়ে পাশের বালির উপর পড়েছে।

ফীল্ডিং এগিয়ে গিয়ে মুঠোটা খুলল।

এই কি সেই বস্তু, যার মধ্যে ধরা রয়েছে মানবজাতির চারটি প্রধান সংকটের সমাধান, আর পৃথিবীর পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস?

ফীল্ডিং তার ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে ধরে আছে একটি দেদীপ্যমান প্রস্তরখণ্ড, যার আয়তন একটি মটরদানার অর্ধেক।

২৭শে নভেম্বর, গিরিডি

এই আশ্চর্য পাথরের টুকরোর মধ্যে কী করে এত তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা যদি কেউ বের করতে পারে ত আমিই পারব, এই বিশ্বাসে আমার চার বন্ধু সেটা আমাকেই দিয়ে দিয়েছে। আমি গত দু সপ্তাহ ধরে আমার গবেষণাগারে অজস্র পরীক্ষা করেও এটার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি। আমি বুঝেছি আরো সময় লাগবে, কারণ আমাদের বিজ্ঞান এখনো এতদূর অগ্রসর হয়নি।

পাথরটা আপাতত আমার ডান হাতের অনামিকায় একটি আংটির উপর বসানো রয়েছে। রাতের অন্ধকারে যখন বিছানায় শুয়ে এটার দিকে দেখি, তখন এই অপার্থিব রত্নখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো আমাকে আজীবন অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা জোগায়।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প

সত্যজিৎ রায়

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের নামে অনেক গল্প প্রায় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানান দেশে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের মতে এই সব গল্পের জন্ম তুরস্কদেশে, কারণ সেখানে এখনো প্রতিবছর নাসীরুদ্দীনের জন্মোৎসব পালন করা হয়।

মোল্লা নাসীরুদ্দীন যে ঠিক কেমন লোক ছিলেন সেটা তাঁর গল্প পড়ে বোঝা মুশকিল। এক এক সময় তাঁকে মনে হয় বোকা, আবার এক এক সময় মনে হয় ভারী বিজ্ঞ। তোমাদের কী মনে হয় সেটা তোমরাই বুঝে নিও।

নাসীরুদ্দীনের বন্ধুরা একদিন তাকে বললে, 'চলো আজ রাত্রে আমরা তোমার বাড়িতে যাব।'

'বেশ, এস আমার সঙ্গে,' বললে নাসীরুদ্দীন।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে বললে, 'তোমরা একটু সবুর কর, আমি আগে গিন্নীকে বলে আসি ব্যবস্থা করতে।'

গিন্নী ত ব্যাপার শুনে এই মারে ত সেই মারে। বললেন, 'চালাকি পেয়েছ? এত লোকের রান্না কি চাট্টিখানি কথা? যাও, বলে এস ওসব হবেটবে না।'

নাসীরুদ্দীন মাথায় হাত দিয়ে বললে, 'দোহাই গিন্নী, ও আমি বলতে পারব না। ওতে আমার ইজ্জত থাকবে না।'

'তবে তুমি ওপরে গিয়ে ঘরে বসে থাক। ওরা এলে যা বলার আমি বলব।'

এদিকে নাসীরুদ্দীনের বন্ধুরা প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষটায় তার বাড়ির সামনে এসে হাঁক দিল, 'ওহে নাসীরুদ্দীন, আমরা এসেছি, দরজা খোল।'

দরজা ফাঁক হল, আর ভিতর থেকে শোনা গেল গিন্নীর গলা।

'ও বেরিয়ে গেছে।'

বন্ধুরা অবাক। 'কিন্তু আমরা ত ওকে ভিতরে ঢুকতে দেখলাম। আর সেই থেকে ত আমরা দরজার দিকেই চেয়ে আছি। ওকে ত বেরোতে দেখিনি।'

গিন্নী চুপ। বন্ধুরা উত্তরের অপেক্ষা করছে। নাসীরুদ্দীন দোতলার ঘর থেকে সব শুনে আর থাকতে না পেরে বললে, 'তোমরা ত সদর দরজায় চোখ রেখেছ, সে বুঝি খিড়কি দিয়ে বেরোতে পারে না?'

নাসীরুদ্দীন তার বাড়ির বাইরে বাগানে কী যেন খুঁজছে। তাই দেখে এক পড়শী জিগ্যেস করলে, 'ও মোল্লাসাহেব, কী হারালে গো?'

'আমার চাবিটা,' বললে নাসীরুদ্দীন।

তাই শুনে লোকটিও বাগানে এসে চাবি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজার পর সে জিগ্যেস করলে, 'ঠিক কোনখানটায় ফেলেছিলে চাবিটা মনে পড়ছে?'

'আমার ঘরে।'

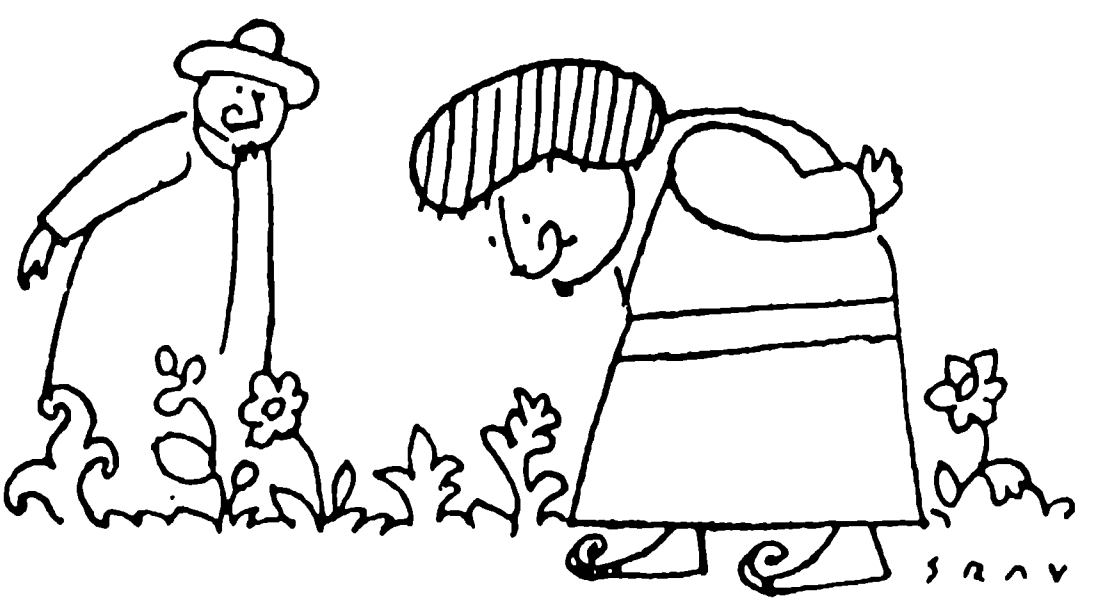

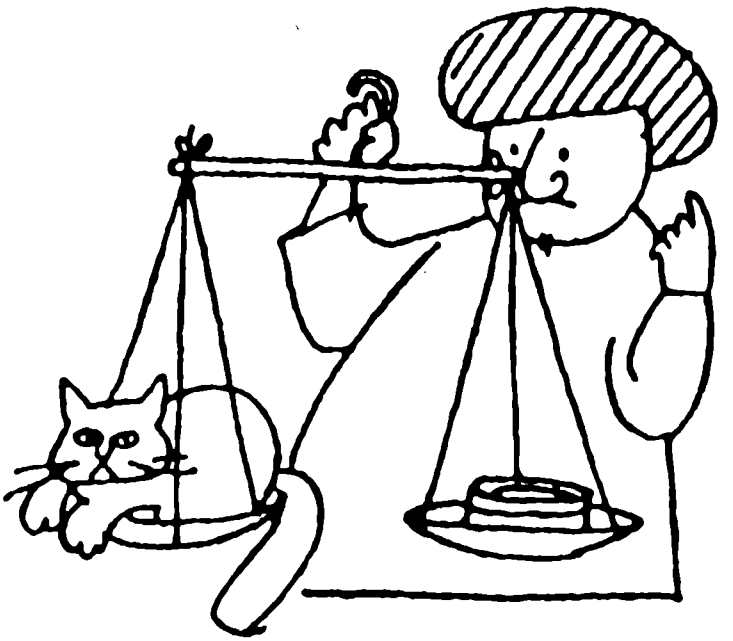

'সে কি ! তাহলে এখানে খুঁজছ কেন ?'

'ঘরটা অন্ধকার,' বললে নাসীরুদ্দীন। 'যেখানে খোঁজার সুবিধে সেইখেনেই ত খুঁজব !'

নাসীরুদ্দীনের পোষা পাঁঠাটার উপর পড়শীদের ভারী লোভ, কিন্তু নানান ফিকির করেও তারা সেটাকে হাত করতে পারে না। শেষটায় একদিন তারা নাসীরুদ্দীনকে বললে, 'ও মোল্লাসাহেব, বড় দুঃসংবাদ। কাল নাকি প্রলয় হবে। এই দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তাহলে পাঁঠাটাকেও ধ্বংস করা হোক,' বললে নাসীরুদ্দীন।

সন্ধেবেলা পড়শীরা দলেবলে এসে দিব্যি ফুর্তিতে পাঁঠার ঝোল খেয়ে গায়ের জামা খুলে নাসীরুদ্দীনের বৈঠকখানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে তাদের জামা উধাও।

'প্রলয়ই যদি হবে,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে জামাগুলো আর কোন কাজে লাগবে ভাই ? তাই আমি সেগুলোকে আগুনে ধ্বংস করে ফেলেছি।'

নাসীরুদ্দীন বাজার থেকে মাংস কিনে এনে তার গিন্নীকে দিয়ে বললে, 'আজ কাবাব খাব ; বেশ ভালো করে রাঁধ দিকি।'

গিন্নী রান্নাটান্না করে লোভে পড়ে নিজেই সব মাংস খেয়ে ফেললে। কর্তাকে ত আর সে কথা বলা যায় না, বললে, 'বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে।'

'এক সের মাংস সবটা খেয়ে ফেলল ?'

'সবটা।'

বেড়ালটা কাছেই ছিল, নাসীরুদ্দীন সেটাকে দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে দেখলে ওজন ঠিক এক সের।

'এটাই যদি সেই বেড়াল হয়,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে মাংস কোথায় ? আর এটাই যদি সেই মাংস হয়, তা হলে বেড়াল কোথায় ?'

নাসীরুদ্দীনের যখন বয়স খুব কম তখন একদিন তার বাপ তাকে বললেন, 'ওরে নসু, এবার থেকে খুব ভোরে উঠিস।'

'কেন বাবা ?'

'অভ্যেসটা ভালো,' বললেন নসুর বাপ। 'আমি সেদিন ভোরে উঠে বেড়াতে গিয়ে রাস্তার মধ্যিখানে পড়ে থাকা এক থলে মোহর পেয়েছি।'

'সে থলে ত আগের দিন রাত্রেও পড়ে থাকতে পারে, বাবা।'

'সেটা কথা নয়। আর তাছাড়া আগের দিন রাত্রেও ওই পথ দিয়ে হাঁটছিলুম আমি ; তখন কোনো মোহরের থলে ছিল না।'

'তাহলে ভোরে উঠে লাভ কি বাবা ?' বললে নাসীরুদ্দীন। 'যে লোক মোহরের থলি হারিয়েছিল সে নিশ্চয় তোমার চেয়েও বেশি ভোরে উঠেছিল।'

শিকারে বেরিয়ে পথে প্রথমেই নাসীরুদ্দীনের সামনে পড়ে রাজামশাই ক্ষেপে উঠলেন। 'লোকটা অপয়া। আজ আমার শিকার পণ্ড। ওকে চাবকে হটিয়ে দাও।'

রাজার হুকুম তামিল হল।

কিন্তু শিকার হল জবরদস্ত। রাজা নাসীরুদ্দীনকে ডেকে পাঠালেন।

'কসুর হয়ে গেছে নাসীরুদ্দীন। আমি ভেবেছিলাম তুমি অপয়া। এখন দেখছি তা নয়।'

নাসীরুদ্দীন তিন হাত লাফিয়ে উঠল।

'আপনি ভেবেছিলেন আমি অপয়া ? আমায় দেখে আপনি ছাব্বিশটা হরিণ মারলেন, আর আপনাকে দেখে আমি বিশ ঘা চাবুক খেলাম। অপয়া যে কে সেটা বুঝতে পারলেন না ?'

নাসীরুদ্দীন একজন লোককে মুখ ব্যাজার করে রাস্তার ধারে বসে থাকতে দেখে জিগ্যেস করলে তার কী হয়েছে। লোকটা বললে, 'আমার জীবন বিষময় হয়ে গেছে মোল্লাসাহেব। হাতে কিছু পয়সা ছিল, তাই নিয়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়েছি, যদি কোনো সুখের সন্ধান পাই।'

লোকটির পাশে তার বোঁচকায় কতগুলো জিনিসপত্র রাখা ছিল। তার কথা শেষ হওয়ামাত্র নাসীরুদ্দীন সেই বোঁচকাটা নিয়ে বেদম বেগে দিলে চম্পট। লোকটাও হাঁ হাঁ করে তার পিছু নিয়েছে, কিন্তু নাসীরুদ্দীনকে ধরে কার

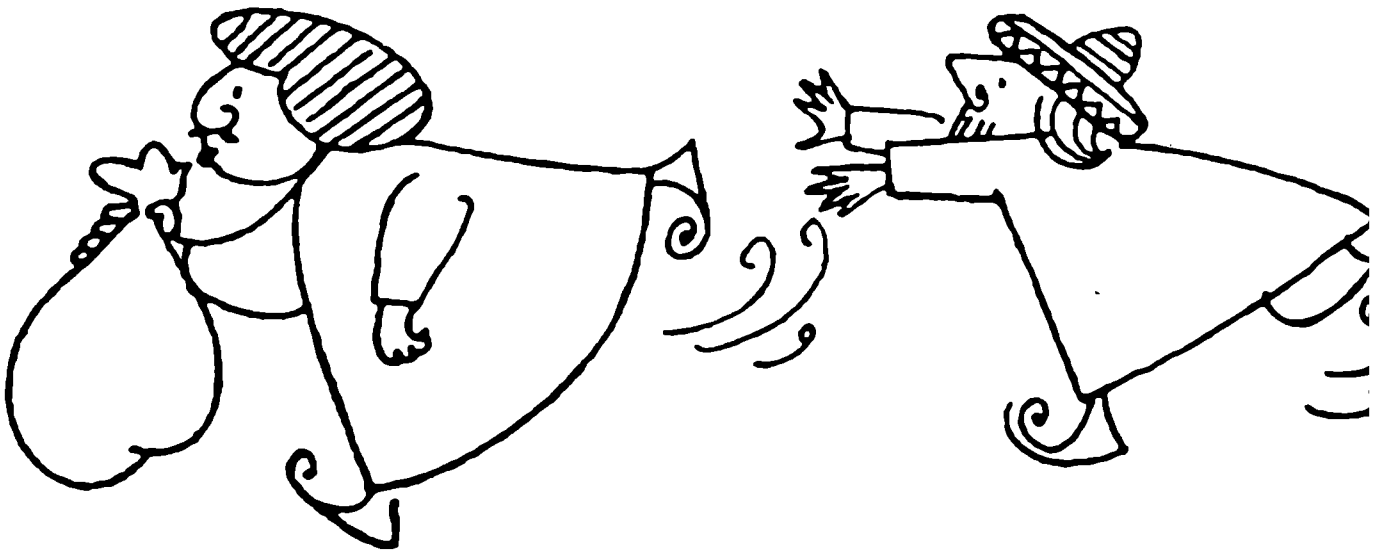

সাধ্য ! দেখতে দেখতে সে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে হাওয়া। এই ভাবে লোকটিকে মিনিটখানেক ধোঁকা দিয়ে সে আবার সদর রাস্তায় ফিরে বোঁচকাটাকে রাস্তার মাঝখানে রেখে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। এদিকে সেই লোকটিও কিছুক্ষণ পরে এসে হাজির। তাকে এখন আগের চেয়েও দশগুণ বেশি বেজার দেখাচ্ছে। কিন্তু রাস্তায় তার বোঁচকাটা পড়ে আছে দেখেই সে মহাফুর্তিতে একটা চিৎকার দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গাছের আড়াল থেকে নাসীরুদ্দীন বললে, 'দুঃখীকে সুখের সন্ধান দেবার এও একটা উপায়।'

তর্কবাগীশ মশাই নাসীরুদ্দীনের সঙ্গে তর্ক করবেন বলে দিনক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে এসে দেখেন মোল্লাসাহেব বেরিয়ে গেছেন। মহা বিরক্ত হয়ে তিনি মোল্লার সদর দরজায় খড়ি দিয়ে লিখে গেলেন 'মূর্খ'।

নাসীরুদ্দীন বাড়ি ফিরে এসে কাণ্ড দেখে এক হাত জিভ কেটে এক দৌড়ে তর্কবাগীশ মশাইয়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে বললে, 'ঘাট হয়েছে পণ্ডিতমশাই, আমি বেমালুম ভুলে গেসলুম আপনি আসবেন। শেষটায় বাড়ি ফিরে দরজায় আপনার নামটা লিখে গেছেন দেখে মনে পড়ল।'

নাসীরুদ্দীন বাড়ির ছাতে কাজ করছে, এমন সময় এক ভিখিরি রাস্তা থেকে হাঁক দিল, 'মোল্লাসাহেব, একবারটি নিচে আসবেন।'

নাসীরুদ্দীন ছাত থেকে রাস্তায় নেমে এল। ভিখিরি বলল, 'দুটি ভিক্ষে দেবেন মোল্লাসাহেব ?'

'তুমি এই কথাটা বলার জন্য আমায় ছাত থেকে নামালে ?'

ভিখিরি কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'মাপ করবেন মোল্লাসাহেব,—গলা ছেড়ে ভিক্ষে চাইতে শরম লাগে।'

'হুঁ...তা তুমি ছাতে এসো আমার সঙ্গে।'

ভিখিরি তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে ছাতে ওঠার পর নাসীরুদ্দীন বললে, 'তুমি এসো হে; ভিক্ষেটিক্ষে হবে না।'

ছবি : সত্যজিৎ রায়

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস

গোলাপী মুক্তা রহস্য

সত্যজিৎ রায়

'সোনাহাটিতে দেখবার কী আছে মশাই?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

"বাংলায় ভ্রমণ'-এ যা বলছে, তাতে একটা পুরোন শিবমন্দির থাকা উচিত, আর একটা বড় দিঘি থাকা উচিত। নাম বোধহয় মঙ্গলদিঘি। ওখানকার এককালের জমিদার চৌধুরীদের কীর্তি। সোনাহাটি বিশ বছর আগে অবধি ছিল একটা গাঁ। এখন ইস্কুল, হাসপাতাল, হোটেল সবই হয়েছে।'

লালমোহনবাবু ঘড়ি দেখলেন। এটা সম্প্রতি কেনা একটা কোয়ার্টজ্ ঘড়ি। বললেন, 'সাংঘাতিক অ্যাকিউরেট টাইম রাখে।'

'আর দশ মিনিট,' ঘড়ি দেখে বললেন ভদ্রলোক।

আমরা তিনজন এবং আরেকটি ভদ্রলোক—নাম নবজীবন হালদার—সোনাহাটি যাচ্ছি ওখানকার রিক্রিয়েশন ক্লাব থেকে নেমন্তন্ন পেয়ে। ওরা ফেলুদা আর নবজীবনবাবুকে সংবর্ধনা দেবে ওদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। নবজীবনবাবু ইতিহাসের নামকরা অধ্যাপক, বই-টইও আছে দু-তিনটে। আমরা থাকব দু'দিন, ওখানকার সবচেয়ে নামকরা বড়লোক পঞ্চানন মল্লিকের গেস্ট হয়ে। মল্লিক হলেন রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। তাঁর নাকি নানারকম পুরোন জিনিসের সংগ্রহ আছে।

'আপনি যে এই নেমন্তন্ন অ্যাক্সেপ্ট করবেন সেটা কিন্তু আমি ভাবিনি', ফেলুদাকে উদ্দেশ্য করে বললেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, 'আর কিছু না—দু'দিনের জন্য যদি কলকাতার বিষাক্ত বায়ু থেকে রেহাই পাওয়া যায় ত মন্দ কি? তা ছাড়া ওখানে আমার এক কলেজের সহপাঠী আছে, নাম সোমেশ্বর সাহা। ওকালতি করে।'

আমাদের ট্রেন মোটামুটি ঠিক সময়ই সোনাহাটি পৌঁছে গেল। আমরা নামতেই একটা দল আমাদের দিকে এগিয়ে এল— তাদের মধ্যে দু'জনের হাতে ফুলের মালা। একজন ফেলুদার গলায় মালা পরিয়ে নমস্কার করে বলল, 'আমি ক্লাবের সেক্রেটারি— নরেশ সেন। আমিই আপনাকে চিঠিটা লিখেছিলাম।'

নবজীবনবাবুকেও মালা পরান হয়েছিল। এবার একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক— সিল্কের পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম— এগিয়ে এলেন। নরেশ সেন বলল, 'ইনিই হচ্ছেন আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পঞ্চানন মল্লিক।'

মল্লিকমশাইয়ের মুখে স্বাগতম্ হাসি। বললেন, 'আপনারা যে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন সেটা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। আমার বাড়িতে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আশাকরি কোনো অসুবিধা হবে না। বড় শহরের সব ফ্যাসিলিটিজ ত এখানে পাবেন না।'

'ও নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না,' বলল ফেলুদা।

'আপনিও ত শুনিচি খ্যাতিমান ব্যক্তি,' লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন ভদ্রলোক।

'আমি লিখি-টিখি আর কি,' বিনয়ী হাসি হেসে বললেন জটায়ু।

মল্লিকমশাইয়ের নীল অ্যাম্বাসাডর স্টেশনের বাইরেই অপেক্ষা করছিল, আমরা পাঁচজন তাতে উঠে পড়লাম— আমি আর জটায়ু সামনে।

'আপনার সংগ্রহের কথা শুনেছি,' গাড়ি রওনা হবার পর বলল ফেলুদা। 'বোধহয় কাগজেও দেখেছি।'

'হ্যাঁ—ওটা আমার অনেকদিনের শখ। অনেক রকম জিনিস আছে আমার কাছে। হালদারমশাইও ইন্টারেস্ট পাবেন, কারণ বেশ কিছু জিনিসের সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আমার লেটেস্ট সংগ্রহ হল মহর্ষির জুতো।'

'মহর্ষির জুতো? সেটা কী ব্যাপার?' ঘাড় ঘুরিয়ে জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'সে ঘটনা জানেন না? হালদারমশাই নিশ্চয়ই জানেন।'

'কী ব্যাপার?'

'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তখন যুবা বয়স, খুব সৌখিন লোক। ঐশ্বর্যে ডুবে আছেন। একবার এক জায়গা থেকে নেমন্তন্ন এল, সেখানে কলকাতার সব রইস আদ্‌মিরা যাবেন। মহর্ষি গেলেন।

কলকাতার বিখ্যাত বাবুমশাইরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত মহামূল্য পোশাক আর অলঙ্কারে ঢেকে এসেছেন। কাশ্মিরী দোরোখা আর জামিয়ার শালে চতুর্দিক ঝলমল করছে। তারই মধ্যে দেখা গেল দেবেন্দ্রনাথ এলেন, পরনে সাদা চোগা, সাদা চাপকান, তার উপরে নকশাহীন সাদা শাল জড়ানো। সকলে ত অবাক। এ কী ব্যাপার? মহর্ষির এই দৈন্যদশা কেন? তারপর সকলের চোখ গেল মহর্ষির পায়ের দিকে। এক জোড়া সাদা নাগরা, তাতে দুটি বিশাল বিশাল হীরে ঝলমল করছে।'

'সেই জুতো আপনি পেয়েছেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'একটি। একটি পেয়েছি— হীরে সমেত। দেখাব আপনাদের।'

পঞ্চাননবাবুর বাগানে ঘেরা বিশাল দোতলা বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় তিনি বড়লোক। গাড়িবারান্দার তলায় গিয়ে গাড়ি থামল। আমরা সবাই নামলাম। সদর দরজায় দু'জন বেয়ারা আর একজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, মল্লিকমশাই একজন বেয়ারাকে বললেন, 'বৈকুণ্ঠ, যাও এঁদের ঘর দেখিয়ে দাও। আর এখন ত সোয়া বারোটা; একটার মধ্যে যাতে খাবার ব্যবস্থা হয় সেটা দেখো।'

আমরা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলাম। মল্লিকমশাই বললেন, 'আপনাদের ঘটনা ত সেই সন্ধ্যায়। ও সময়টা কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা; আশাকরি গরম কাপড় আছে সঙ্গে।'

'পৌষ মাসে গ্রামাঞ্চলে ঠাণ্ডা হবে সেটা আমরা জানতাম,' বলল ফেলুদা।

একটা প্যাসেজের দু'দিকে তিনটে ঘর আমাদের জন্য রাখা হয়েছে। হালদারমশাই তাঁর ঘরে চলে গেলেন, আমরা তিনজন গিয়ে ঢুকলাম ফেলুদার আর আমার ঘরে। চীনেমাটির টুকরো দিয়ে ঢাকা মেঝে, যাকে ইংরাজিতে বলে Crazy China। এককালে টানা-পাখার ব্যবস্থা ছিল সেটা দেয়ালের উপর দিকে ফুটো দেখলেই বোঝা যায়।

'এঁর টাকা হচ্ছে তামার খনির টাকা,' বলল ফেলুদা। 'আমার এক মক্কেল এঁকে ভালো করেই চেনেন।'

'আবহাওয়াটা যে কলকাতার তুলনায় নির্মল সেটা এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে,' বললেন লালমোহনবাবু।

আমিও সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। তা ছাড়া কানটাও আরাম পাচ্ছে। ট্র্যাফিক বলে কোনো ব্যাপার নেই; এখনো পর্যন্ত একটাও হর্ন শুনিনি।

একজন বেয়ারা একটা থালায় তিন গেলাস সরবত দিয়ে গেল। সেই সরবত খেতে না খেতেই খবর এল যে নিচে খাবার ঘরে পাত পড়েছে।

॥ ২ ॥

আতিথেয়তায় মল্লিকমশাই যে একেবারে পয়লা নম্বর সেটা খাবার বহর দেখেই বোঝা গেল। মাছের যে এতরকম জিনিস রান্না হতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। ফেলুদা অল্প খায়, কিন্তু লালমোহনবাবু ভোজনরসিক— খুব তৃপ্তি করে খেলেন। ওঁর খুশির আরেকটা কারণ হচ্ছে যে পঞ্চাননবাবু ওঁর লেখা সম্বন্ধে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করছিলেন তাই ভদ্রলোক নিজের ঢাক পেটাবার একটা সুযোগ পেলেন।

খাবার পর মল্লিকমশাই বললেন, 'এবার আপনাদের একটু এনটারটেন করব। চলুন আমার সংগ্রহের কিছু জিনিস দেখাই।'

আমরা আবার দোতলায় ফিরে এলাম। এবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে না ঘুরে বাঁদিকে ঘুরলাম। এদিকেই পঞ্চাননবাবুর ঘর আর তাঁর সংগ্রহশালা।

জিনিসপত্র অনেকরকম জোগাড় করেছেন ভদ্রলোক তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রত্যেকটারই আবার একটা করে পরিচয় আছে। মহর্ষির নাগরাটা প্রথমেই দেখা হল, তারপর ক্রমে টিপুর নস্যির কৌটো, ক্লাইভের ট্যাঁকঘড়ি, সিরাজদ্দৌলার রুমাল, রানি রাসমণির পানবাটা— এ সবই দেখলাম। আমরা সকলেই অবিশ্যি খুবই তারিফ করলাম, কিন্তু আমার যেন কেমন-কেমন লাগছিল। কোন জিনিসটা কার ছিল সেটা জানা গেল কি করে? ক্লাইভের ঘড়িতে ত আর ক্লাইভের নাম লেখা নেই। বা সিরাজদ্দৌলার রুমালেও নেই।

সব দেখেটেখে চারজনে ঘরে ফেরার পথে নবজীবনবাবু ফেলুদাকে জিগ্যেস করলেন, 'কেমন মনে হল?'

ফেলুদা বলল, 'খুব কনভিনসিং লাগল না।'

'কনভিনসিং? ওর মধ্যে একটা জিনিসও জেনুইন নেই। লোকটা বোগাস, হামবাগ। মহর্ষির নাগরা থেকে ত রীতিমতো নতুন চামড়ার গন্ধ বেরোচ্ছিল।'

ঘণ্টা তিনেক বিশ্রামের সময় ছিল, তারপর অনুষ্ঠানে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। ফেলুদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরল বোধহয় আজ দশ বছর পর। ওকে পোশাকটা যে দারুণ মানায় সেটা স্বীকার করতেই হয়। লালমোহনবাবু একটা নকশাদার কাশ্মিরী শাল চাপিয়েছিলেন, বললেন সেটা ওঁর ঠাকুরদাদার ছিল।

ঠিক পৌনে ছ'টায় বেয়ারা পাঠিয়ে আমাদের ডেকে নিলেন পঞ্চাননবাবু।

শীতকাল, তাই এর মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অনুষ্ঠানের জায়গায় পৌঁছে দেখি আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। স্পটলাইট, ফ্লুয়োরেসেন্ট লাইট, রঙিন বাল্‌ব— কিছুরই অভাব নেই।

আমরা মঞ্চে গিয়ে বসলাম। সংবর্ধনার ব্যাপারটা একেবারে শেষে— অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স। তার আগে নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটকের অংশের দৃশ্য— সবই হল। সকলেই আজ জান দিয়ে দিচ্ছে ফেলুদাকে ইমপ্রেস করার জন্য, ফেলুদাও হাততালিতে কার্পণ্য করছে না।

সংবর্ধনার ব্যাপারটা কুড়ি মিনিটে সারা হয়ে গেল ! সময় একটু লাগল মানপত্রটা পড়তে। এটা বলতেই হবে যে মানপত্র দুটো দেখতে বেশ ভালো হয়েছে, আর যে লিখেছে তার হাতের লেখা খুব ভালো। সব শেষে কয়েকজন সাংবাদিক ফেলুদাকে ঘিরে ধরল, আর তাদের কিছু প্রশ্নের জবাবও দিতে হল ফেলুদাকে। সে বলল এখন তার অবসর— হাতে কোনো কেস নেই।

নবজীবনবাবু অনুষ্ঠানের শেষে পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেলেন, আমরা রয়ে গেলাম কারণ আমাদের নেমন্তন্ন আছে ফেলুদার সহপাঠী সোমেশ্বর সাহার বাড়িতে। ভিড় কমবার পরেই ভদ্রলোক হাসিমুখে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন।

'চিনতে পারছিস ?'

'অনায়াসে,' বলল ফেলুদা। 'গোঁফটা ছাড়া আর প্রায় কিছুই বদলায়নি।'

'তুইও মোটামুটি একই রকম আছিস, তবে চোখে একটা দীপ্তি দেখছি যেটা বুদ্ধি পাকবার ফলে হয়েছে। ক'টা কেস হ্যান্ডল করলি এ পর্যন্ত ?'

'হিসেব নেই,' বলল ফেলুদা। 'গোড়ার দিকে হিসেব রাখতাম, আজকাল ছেড়ে দিয়েছি।'

'তোর সঙ্গে একজন আলাপ করতে ভীষণ আগ্রহী'— সোমেশ্বর সাহা তাঁর পিছনে দাঁড়ান এক ভদ্রলোককে পিঠে হাত দিয়ে সামনে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। — 'এঁর নাম জয়চাঁদ বড়াল। এখানকারই বাসিন্দা। ইনিই মানপত্রটা ডিজাইন করেছেন।'

'তাই বুঝি ?' বলল ফেলুদা। 'খুব ভালো হয়েছে। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম।'

জয়চাঁদবাবু লজ্জায় ঘাড় নিচু করে বললেন, 'আপনার কাছ থেকে প্রশংসা পাবো এ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত।'

'আজ ইনিও আমাদের বাড়িতেই খাচ্ছেন,' বললেন সোমেশ্বরবাবু। 'চ—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে গেঁজিয়ে কোনো লাভ নেই। আমার বাড়ি বেশি দূর নয়। মিনিট দশেক পা চালাতে পারবি ত ?'

'জরুর।'

সোমেশ্বরবাবুর বাড়ি বড় না হলেও, বেশ গুছোন। সেটা বোধহয় ওঁর স্ত্রীর জন্য। স্ত্রী ছাড়া একটি দশ বছরের ছেলেও আছে ভদ্রলোকের। জয়চাঁদবাবু সমেত আমরা চারজনে বৈঠকখানায় বসার দশ মিনিটের মধ্যেই সরবত এসে গেল। স্ত্রী উমাদেবী বললেন, 'আগে সরবতটা খান— সাড়ে ন'টার মধ্যে আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

মিনিট পাঁচেক এটা-সেটা নিয়ে কথা হবার পর সোমেশ্বরবাবু জয়চাঁদ বড়ালকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁর একটা বিশেষ কিছু বলার আছে তোকে। আমার মনে হয় তুই ইন্টারেস্ট পাবি।'

'বটে ?' বলল ফেলুদা। 'কী ব্যাপার শুনি।'

'কিছুই না,' সলজ্জ হাসি হেসে বললেন জয়চাঁদবাবু, 'আমাদের ফ্যামিলি সংক্রান্ত একটা ব্যাপার।'

লালমোহনবাবু আগ্রহের সঙ্গে একটু এগিয়ে বসলেন। 'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার ?'— গল্পের গন্ধ পেলেই ভদ্রলোক চনমনিয়ে ওঠেন।

জয়চাঁদবাবু হাত থেকে সরবতের গেলাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'আমি নিজে এখন ইস্কুল মাস্টারি করি, কিন্তু আমার পৈতৃক ব্যবসা ছিল হীরে-জহরতের। কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে আমাদের একটা গয়নার দোকান এখনো আছে ; সেটা দেখেন আমার এক কাকা। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি ছিলেন আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা— নাম ছিল অভয়চরণ বড়াল। তিনিই এই ব্যবসা আরম্ভ করেন। জাহাজে করে ভারতবর্ষের উপকূলে সব শহরে গিয়ে হীরে পান্না কেনাবেচা করতেন। মাদ্রাজের কাছাকাছি কোনো একটা শহরে তিনি একবার একটা রত্ন পান। সেটা তিনি যত্ন করে জমিয়ে রেখেছিলেন। সে রত্ন এখনো আমার কাছে রয়েছে। সেটা আমি আপনাদের দেখাতে চাই।'

'সঙ্গে এনেছেন ?' জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খয়েরি রঙের রুমাল বার করলেন, তাতে গেরো দিয়ে বাঁধা একটা ছোট্ট লাল ভেলভেটের বাক্স। বাক্স খুলে তার থেকে একটা মুক্তো বার করে ভদ্রলোক আমাদের সামনে ধরলেন।

ফেলুদা উত্তেজনায় ভরা চাপা স্বরে বলে উঠল—

'একি— এ যে পিংক পার্ল !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন জয়চাঁদ বড়াল। 'অবিশ্যি গোলাপী হওয়ায় এর কোনো বিশেষত্ব আছে কিনা জানি না।'

'কী বলছেন আপনি !' বলল ফেলুদা। 'ভারতবর্ষে যতরকম মুক্তো পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য আর সবচেয়ে মূল্যবান হল গোলাপী মুক্তো।'

'মুক্তো সাদা ছাড়া হয় তাই ত জানতাম না,' বললেন লালমোহনবাবু।

'সাদা লাল কালো হলদে নীল— সবরকম হয়,' বলল ফেলুদা। তারপর জয়চাঁদবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'শুনুন— আপনি ও জিনিস ওভাবে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। বাড়িতে সিন্দুক থাকলে তাতে রেখে দেবেন।'

'আজ্ঞে এটা আমি বার করি না বললেই চলে। আজ আপনাকে দেখাব বলে নিয়ে এলাম।'

'আর কাকে দেখিয়েছেন ওটা ?'

'মাত্র একজন। গত সপ্তাহে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি বণিকদের নিয়ে একটা বই লিখছেন— তাঁকে দেখিয়েছিলাম।'

'এ ছাড়া আর কেউ জানে না ত ?'

'কী আর বলব বলুন— এই ভদ্রলোক, যিনি বই লিখছেন— তিনি আবার ঘটনাটা

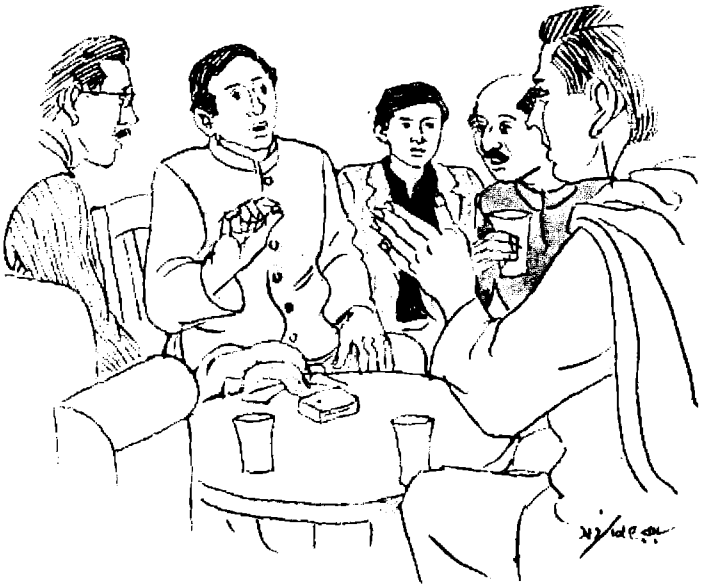

এক সাংবাদিককে বলেন। ফলে পরদিনই সেটা কাগজে বেরিয়ে যায়।'

'কলকাতার কাগজে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনটে বাংলা কাগজে বেরিয়েছে। আপনি ফিরে গিয়ে সেটা দেখতে পাবেন।'

'গোলাপী মুক্তো বলে বলা আছে তাতে?'

'তাই ত বলেছে। একটা কাগজে ত এ-ও বলে দিয়েছে যে মুক্তোর মধ্যে গোলাপী মুক্তোই সবচেয়ে ভ্যালুয়েব্‌ল।'

'সর্বনাশ!' কপালে হাত ঠুকে বললে ফেলুদা। 'আমি আপনাকে জোর দিয়ে বলছি এ জিনিস আপনি কাউকে কখনও দেখাবেন না। এই একটা মুক্তোর দাম কত তা আপনি কল্পনা করতে পারেন? বিক্রি করলে আপনি যা দাম পাবেন তাতে আপনার পরের দুই পুরুষ পর্যন্ত খাওয়া-পরার কোনো ভাবনা থাকবে না।'

'এটা আপনি আমাকে বলে খুব উপকার করলেন।'

আমরা তিনজনেই একবার করে মুক্তোটা হাতে নিয়ে দেখলাম। নিটোল চেহারা। ফেলুদা বলল যে, শেপের দিক দিয়েও মুক্তোটা অসাধারণ।

জয়চাঁদবাবু তাঁর সম্পত্তি আবার পকেটে পুরে নিলেন। ফেলুদা 'ছিক্' করে একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করে বলল, 'খবরটা কাগজে বেরোন খুবই আনফরচুনেট ব্যাপার। আশা করি কোনো গোলমাল হবে না।'

'যদি হয় তা হলে কি আমি আপনাকে জানাব?'

'নিশ্চয়ই। আমার ঠিকানা, ফোন নম্বর সবই সোমেশ্বর জানে। আপনি বিনা দ্বিধায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এমন কি দরকার হলে ওটাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে পারেন।'

॥ ৩ ॥

আমরা পরদিন সকালে হাওড়া এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে বিকেলে কলকাতা পৌঁছে গেলাম। আমাদের সঙ্গে হালদারমশাইও ফিরলেন। দেখলাম ফেলুদা ওঁর সামনে একবারও গোলাপী মুক্তোর উল্লেখ করল না।

বাড়িতে এসে ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল।

'মুক্তোর খবরটা কাগজে বেরোনটা মারাত্মক ভুল হয়েছে।'

আসবার তিন দিন পরে সকালে বসবার ঘরে বসে কথাসরিৎসাগর পড়ছি, ফেলুদা ক্লিপ দিয়ে নখ কাটছে, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফেলুদা উঠে ধরল। কথা শেষ হয়ে যাবার পর ফেলুদা বলল, 'বড়াল।'

'কলকাতায় এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে বিশেষ দরকার। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আসছে। কথা শুনেই বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক খুবই উত্তেজিত।'

আমরা ফোন করে লালমোহনবাবুকে ডাকিয়ে নিলাম। কোনো মামলার কোনো জরুরি অংশ থেকে বাদ পড়লে উনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন। বলেন, 'কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারি না। ফলে চিন্তা করে যে আপনাকে হেল্‌প করব তারও উপায় থাকে না।'

ভদ্রলোক ঠিক পাঁচটায় এসে পড়লেন, আর তার আধঘণ্টা পরে, শ্রীনাথ চা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, এসে পড়লেন জয়চাঁদ বড়াল।

এ চেহারাই আলাদা। এই তিন দিনে ভদ্রলোকের উপর দিয়ে যে বেশ ধকল গেছে সেটা বোঝাই যায়। ইতিমধ্যে দুটো ইংরিজি কাগজেও পিংক পার্লের খবরটা বেরিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

জয়চাঁদবাবু এক গেলাস জল খেয়ে আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়িয়ে বললেন, 'একটা খবরের কাগজের খবর থেকে যে এত কিছু ঘটতে পারে এ আমার ধারণা ছিল না। তিনটে ঘটনা আপনাকে বলার আছে। এক হচ্ছে আমার এক খুড়তুতো ভাই— নাম হচ্ছে মতিলাল বড়াল— তার একটা চিঠি। সে বহুকাল থেকে বেনারসে আছে। একটা সিনেমা হাউস চালায়। সে লিখেছে যে যদি আমি মুক্তোটা বিক্রি করি তা হলে যা পাবো তার একটা অংশ তাকে দিতে হবে। মুক্তোটা পরিবারের সম্পত্তি, শুধু আমার একার নয়। চিঠিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে মুক্তোর ব্যাপারটা আমি তার কাছ থেকে গোপন করে গেছি।'

'আর দুই নম্বর?'

'সেটাও একটা চিঠি, এসেছে ধরমপুর বলে উত্তরপ্রদেশের একটা শহর থেকে। আমি ইস্কুলের লাইব্রেরির বই ঘেঁটে জেনেছি যে ধরমপুর একটা করদ রাজ্য ছিল। যিনি চিঠিটা লিখেছেন তিনিই যে ধরমপুরের সর্বেসর্বা তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ঠিকানা হচ্ছে ধরমপুর প্যালেস। লেখকের নাম সূরয সিং। এঁর নাকি মুক্তোর বিরাট কালেকশন আছে, কিন্তু গোলাপী মুক্তো নেই! মুক্তোটা উনি কিনতে চান। আমি কত দাম চাই সেটা অবিলম্বে তাঁকে জানাতে হবে।'

'আর তিন নম্বর?'

'সেটাই সবচেয়ে মারাত্মক। এক ভদ্রলোক— পশ্চিমা কিংবা মাড়োয়ারি হবে— পরশু আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। তিনি অনেক কিছু কালেক্ট করেন। কথায় বুঝলাম সেসব জিনিস তিনি ভালো দামে বিদেশে পাচার করেন। জামাকাপড়, হাতের আংটি, কানের হীরে ইত্যাদি দেখে মনে হল খুব মালদার লোক।'

'এঁরও কি মুক্তোটা চাই?'

'হ্যাঁ। তার জন্য তিনি চল্লিশ হাজার টাকা দিতে রাজি আছেন। আমি অবিশ্যি হ্যাঁ না কিছুই বলিনি। তিন দিন সময় চেয়েছি। ভদ্রলোক এখন কলকাতায়। তাঁর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন। আমাকে কাল সকাল দশটায় তাঁর কাছে গিয়ে একটা কিছু বলতে হবে। মনে হল ভদ্রলোক মুক্তোটা পেতে বদ্ধপরিকর। হয়ত দাম একটু বাড়াতে পারেন, কিন্তু মুক্তোটা ওঁর চাই।'

'এঁর নাম জানেন নিশ্চয়ই।'

'জানি।'

'কী?'

'মগনলাল! মগনলাল মেঘরাজ।'

আমরা তিনজনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য থ মেরে গেলাম। আর কতবার এই লোকটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে? প্রতিপক্ষ হিসেবে এর চেয়ে সাংঘাতিক আর কাউকে কল্পনা করা যায় না। আর ইনিই গিয়ে হাজির হয়েছেন বড়ালমশাইয়ের কাছে? এঁরও দরকার হয়ে পড়েছে গোলাপী মুক্তো?

মুখে ফেলুদা বলল, 'আপনি সোজা না করে দেবেন। ওই মুক্তোর দাম ওর চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। ভদ্রলোক এই পাথর মোটা দামে বিদেশে পাচার করবেন। দালালী করাই হচ্ছে ওঁর ব্যবসা। ওঁকে আমরা পাঁচ বছর ধরে চিনি।'

'কিন্তু উনি যদি আমার কথা না শোনেন?'

ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'বেশ কড়া মেজাজে কথা বলছিলেন কি ভদ্রলোক?'

'তা বলছিলেন বটে,' বললেন জয়চাঁদবাবু 'এমন কি এ-ও বলেছিলেন যে ওঁর মুক্তোটা পাবার রাস্তা কেউ বন্ধ করতে পারবে না।'

'আপনি একটা কাজ করুন— মুক্তোটা আমাকে দিয়ে যান। আপনি সঙ্গে নিয়ে গেলে ওটা ও আদায় করে ছাড়বে। তার জন্য যদি খুনও করতে হয় তাতেও পেছপা হবে না। লোকটা সাংঘাতিক।'

'কিন্তু ওকে আমি কী বলব?'

'বলবেন আপনি মুক্তোটা বেচবেন না। তাই ওটা আর সঙ্গে করে আনেননি। ওরকম একটা প্রেশাস জিনিস ত কলকাতায় পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না।'

'বেশ, তা হলে আপনিই রাখুন।'

ভদ্রলোক আবার রুমালের গেরো খুলে বাক্স থেকে মুক্তোটা বার করে ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা তৎক্ষণাৎ মুক্তোটা নিজের ঘরের গোদরেজের আলমারিতে রেখে দিল। তারপর ফিরে এসে সোফায় বসে বলল, 'আর সেই সূরয সিংকে কী বলবেন? তিনিও বেশ নাছোড়বান্দা বলে মনে হচ্ছে।'

'তাঁকেও না করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দেড়শো বছরের ওপর জিনিসটা আমাদের কাছে রয়েছে, আর এখন হাতছাড়া হয়ে যাবে? আমার ত টাকার অভাব নেই, টাকার লোভও নেই। আমার ত চাকরি আছেই, তা ছাড়া বাড়ি আছে। ধান জমি আছে, চাষ করে মোটামুটি ভালোই আয় হয়। তিনটি প্রাণী ত সংসারে— আমার দিব্যি চলে যায়।'

'দেখুন কাল সকালে কী হয়। যাই হোক না কেন, আমাকে জানিয়ে যাবেন। আমাকে জানিয়ে আসারও কোনো দরকার নেই।'

ভদ্রলোক চা খেয়ে উঠে পড়লেন। উনি বেরিয়ে যাবার পর লালমোহনবাবু বললেন, 'এই রাহু থেকে আমাদের মুক্তি নেই। এবারে আর কী খেল দেখাবে কে জানে!'

ফেলুদা বলল, 'তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে প্রতিবারই আমরা ওকে জব্দ করেছি।'

'সেটি ঠিক। ভালো কথা, আমার এক পড়শী আছে জহুরি, নাম রামময় মল্লিক। বৌবাজারে দোকান আছে— মল্লিক ব্রাদার্স। ওঁকে গিয়ে পিংক পার্লের কথাটা বলতে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল। উনিও কনফার্ম করলেন যে এত ভ্যালুয়েব্‌ল মুক্তো আর হয় না।'

ফেলুদা বলল, 'কাল সকালে কী হয় তার উপর সব নির্ভর করছে। মগনলাল যদি জেনে ফেলে জয়চাঁদবাবু আমার এখানে এসেছিলেন, তা হলেই মুশকিল।'

'আপনি মুক্তোটা নিজের কাছে রেখে একটা বড় রিস্ক নিয়েছেন।'

'ও ছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না। ওটা না করলে মুক্তো কাল মগনলালের হাতে চলে যেত।'

॥ ৪ ॥

জয়চাঁদ বড়ালের কথা

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে মগনলালের বাড়ি বার করতে বেশি সময় লাগল না। বাড়ির বাইরেটা দেখে ভিতরে ঢুকতেই ইচ্ছা করে না, কিন্তু একবার ঢুকে পড়লে দেখা যায় বেশ তক্‌তকে পরিচ্ছন্ন।

একজন চাকর এসে জয়চাঁদবাবুকে তিন তলায় নিয়ে গেল। তারপর একটা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে ঘোষণা করল যে বড়ালবাবু এসেছেন।

'ভিতরে আসুন,' মগনলালের গম্ভীর গলায় শোনা গেল।

জয়চাঁদ বড়াল ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

মগনলাল এক পাশে গদিতে বসে আছে। অন্য পাশে সোফা রয়েছে, তারই একটাতে বড়াল বসলেন।

'কী ডিসাইড করলেন?' মগনলাল প্রশ্ন করল।

'ওটা বেচব না।'

মগনলাল কিছুক্ষণের জন্য চুপ। তারপর বলল, 'আপনি ভুল করছেন, জয়চাঁদবাবু। আমাকে রিফিউজ করে কোনো লোক রেহাই পায়নি। আপনি কি দাম বাড়াতে চাচ্ছেন?'

'না। আমি ওটা ফ্যামিলিতেই রাখতে চাই। চার পুরুষ ধরে রয়েছে, এখনো থাকুক।'

'আপনার বাড়ি যা দেখলাম

সোনাহাটিতে, তাতে আপনার মান্থলি ইনকাম্ দেড়-দু হাজারের বেশি বলে মনে হয় না। আর এতে আপনি একসঙ্গে ক্যাশ অনেক টাকা পেয়ে যাবেন। হোয়াই আর ইউ বিইং সো ফুলিশ ?'

'এটা বংশমর্যাদার ব্যাপার। এটা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না।'

'ওই মোতি কোথায় আছে ?'

'আমার কাছে নেই।'

'ওটা আপনি আনেননি ?'

'বেচবই না যখন ঠিক করলাম তখন আর আনব কেন ?'

মগনলাল তার সামনেই রাখা একটা ঘণ্টার উপর চাপড় মারল। টুং শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকর এসে ঘরে দাঁড়াল।

'গঙ্গা— এই বাবুকে সার্চ করো।'

গঙ্গা বেশ ষণ্ডা লোক ; সে একটানে জয়চাঁদবাবুকে বসা অবস্থা থেকে দাঁড় করালো। তারপর সর্বাঙ্গ সার্চ করে একটা মানিব্যাগ, একটা রুমাল আর একটা মশলার কৌটো বার করে মগনলালের সামনে রাখল।

'ঠিক হ্যায়,' বলল মগনলাল। 'ওয়াপিস দে দেনা।'

চাকর জয়চাঁদবাবুকে তার জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

'বসুন আপনি।'

জয়চাঁদবাবু আবার সোফায় বসলেন। মগনলাল বলল, 'সোনাহাটিতে জানলাম কি আপনাদের ক্লাব প্রদোষ মিটারকে রিসেপশন দিয়েছে।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?'

'আপনার সব কথার জবাব দিতে ত আমি বাধ্য নই।'

'আপনার জবাবের দরকার নেই, বিকজ আই অলরেডি নো। আপনি যখন হাওড়াতে ট্রেন থেকে নামলেন, তখন থেকে আমার লোক আপনাকে নজরে রেখেছে। আপনি শিয়ালদায় যোগমায়া হোটেলে উঠেছেন— রাইট ?'

'ঠিক।'

'বিকেল পাঁচটার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে আপনি ট্যাক্সি করে সাউথে যান। আপনার ডেস্টিনেশন ছিল ফেলু মিটারের বাড়ি— রাইট ?'

'আপনি ত সবই জানেন।'

'আপনার মোতি এখন ফেলু মিটারের জিম্মায় আছে।'

জয়চাঁদবাবু চুপ করে রইলেন। মগনলাল বলল, 'ইউ হ্যাভ ডান সামথিং ডেরি স্টুপিড, মিস্টার বড়াল। আপনি পার্লটা আমাকে দি'ল চালিস হাজার টাকা পেতেন। এখন আমি সে পার্ল আদায় করে নেবো, আর আপনি আমার কাছ থেকে একটা পইসাও পাবেন না।'

জয়চাঁদবাবু উঠে পড়লেন।

'আমি তা হলে এখন আসতে পারি ?'

'পারেন। আমাদের বিজনেস খতম। তবে আপনার জন্য আমার আপসোস হচ্ছে।'

॥ ৫ ॥

ফোন না করে দুপুর বারোটা নাগাত জয়চাঁদবাবু নিজেই এসে হাজির। মগনলালের সঙ্গে তাঁর কী ঘটল না ঘটল বর্ণনা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি মুক্তোর ব্যাপারটা কী করবেন ?'

ফেলুদা বলল, 'যদ্দুর বুঝতে পারছি, মগনলাল আন্দাজ করছে যে মুক্তোটা আমার কাছে রয়েছে। লোকটা অত্যন্ত তুখোড়। সোজাসুজি যদি আমার কাছে এসে পড়ে তা হলেও আশ্চর্য হব না। যে জিনিসটা এতকাল আপনাদের ফ্যামিলিতে ছিল, সেটা এখন হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে আপনার মন খারাপ লাগবে সেটাও আমি বুঝি। কিন্তু তাও আমি বলব যে মুক্তোটা আমার কাছেই থাক। আপনার কাছে থাকলে ও যেন-তেন-প্রকারেণ ওটা আদায় করে নেবে। সেটা ভালো হবে না।'

জয়চাঁদ রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি বিক্রি না করলে ত ও মুক্তোটা এমনিতেই পাবে না। আপদ বিদেয় হোক, তারপর ওটা আমার কাছে ফিরে যেতে পারে।'

'ঠিক কথা,' বলল ফেলুদা। 'আপনি আজই ফিরছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্ধ্যের গাড়িতে।'

'কোনো খবর থাকলে জানাতে ভুলবেন না।'

পরদিন সকালে সাড়ে সাতটার সময় ফোন এল। সোনাহাটি থেকে। সোমেশ্বর সাহা। ফেলুদা কথা বলা শেষ

করে ফোনটা রেখে গম্ভীর মুখ করে বলল, 'কাল রাত্তিরে ট্রেনে জয়চাঁদ বড়ালের মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে কে বা কারা যেন তার বাক্স সার্চ করে। জিনিসপত্র সব ছত্রাকার হয়ে পড়ে ছিল। অবিশ্যি সোনাহাটি আসবার আগেই ভদ্রলোক জ্ঞান ফিরে পান।'

আমি বললাম, 'এ-ও ত মগনলালেরই ব্যাপার।'

'নিশ্চয়ই,' বলল, ফেলুদা। 'লোকটা কোনরকম সুযোগ ছাড়ে না। ভাগ্যিস মুক্তোটা আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম।'

একটা নতুন কেসের গন্ধ পেলে জটায়ু মাঝে মাঝে বিকেলেও এসে হাজির হন। আজও তাই হল। বললেন, 'মনটা পড়ে রয়েছে এখানে তাই বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না।'

ফেলুদা লেটেস্ট খবরগুলো লালমোহনবাবুকে দিয়ে দিল।

'তা হলে ত মনে হচ্ছে ওঁর পায়ের ধুলো এবার এখানে পড়বে। ও ত নির্ঘাত বুঝে গেছে যে মুক্তোটা আপনার কাছে রয়েছে।'

লালমোহনবাবু কথাটা বলার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাইরে একটা গাড়ি এসে যাবার শব্দ পেলাম। তারপর দরজার বেল বেজে উঠল। খুলে দেখি আসল লোক এসে হাজির।

'মে আই কাম ইন, মিস্টার মিটার?' বললেন মগনলাল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

ভদ্রলোক ঢুকে এলেন। সেই কালো শেরওয়ানি আর ধুতি, পায়ে মোজা আর পাম্প শু।

'অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল কি আপনার বাড়িতে একবার আসি। আমাদের এতদিনের দোস্তি— হে হে হে! আঙ্কল কেমন আছেন?'

লালমোহনবাবুকে মগনলাল যা নাস্তানাবুদ করেছে, ভদ্রলোক আর কোনোদিন মগনলালের সামনে স্বাভাবিক হতে পারবেন বলে মনে হয় না। শুক্‌নো গলায় জটায়ু উত্তর দিলেন, 'ভালো আছি।'

'চা খাবেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'না স্যার। নো টী। আমি আপনার বেশি সময় নেব না। আমি কেন এসেছি তা বোধহয় আপনি বুঝতে পারছেন।'

'তা বোধহয় পারছি।'

'তা হলে আর টাইম ওয়েইস্ট করার দরকার নেই। হোয়ার ইজ দ্যাট পার্ল?'

'মিস্টার বড়ালের কাছে যে নেই তা ত আপনি জানেন। আপনার লোক ত ট্রেনে তাঁকে ঘায়েল করে তাঁর বাক্স সার্চ করে মোতি খুঁজে পায়নি।'

'আমার লোক?'

'তা ছাড়া আর কার লোক হবে বলুন।'

'আপনি এভাবে বলবেন না, মিস্টার মিটার। আপনার কোনো প্রমাণ নেই যে আমার লোক কাজটা করেছে।'

'আপনার ক্ষেত্রে প্রমাণের দরকার হয় না, মগনলালজী। আপনার কাজ মার্কামারা কাজ। সে কাজ আমি দেখলেই বুঝতে পারি।'

'আমি আবার জিগ্যেস করছি— সে পার্ল কোথায় আছে?'

'আমার কাছে।'

'ওটা আমার দরকার।'

'যা দরকার তা কি সব সময়ে পাওয়া যায়?'

'মগনলাল মেঘরাজ ক্যান অলওয়েজ গেট ইট। কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, মিস্টার মিটার। আমার ওই পিংক পার্ল চাই। না হলে, আপনি ত জানেন, আমি যেমন করে হোক ওটা আদায় করে নেবো।'

'তা হলে সেটাই করুন, কারণ মুক্তো আমি আপনাকে দিচ্ছি না।'

'দেবেন না?'

'ভদ্রলোকের এক কথা।'

'তা হলে আমি আসি।' মগনলাল উঠে পড়লেন। 'গুড বাই, আঙ্কল।'

'গুড বাই,' ক্ষীণস্বরে বললেন জটায়ু।

দরজার কাছে গিয়ে মগনলাল নেমে ফেলুদার দিকে ঘুরলেন। তারপর বললেন, 'আমি তিন দিন সময় দিচ্ছি আপনাকে। আজ সোমবার। সোম, মঙ্গল, বুধ। বুঝেছেন?'

'বুঝেছি।'

মগনলাল বেরিয়ে গেলেন।

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না মোটেই। দিয়ে দিন মশাই, দিয়ে দিন। আর আপনি কাছেই বা আর কত দিন রাখতে পারবেন। বড়ালকে ত তাঁর জিনিস ফেরত দিতে হবে— তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এত সাধের জিনিস।'

'যদ্দিন মুক্তো বেহাত হবার আশঙ্কা আছে ততদিন এটা বড়ালকে ফেরত দেওয়া যাবে না। সব সংশয় কাটিয়ে উঠলে পর যেখানের মুক্তো সেখানে যাবে।'

'কিন্তু বড়াল যে এক মহারাজার কথা বলছিল তার সম্বন্ধেও ত একটু খোঁজ নেওয়া দরকার।'

'সে খোঁজ দিতে পারেন সিধু জ্যাঠা। বহুদিন জ্যাঠার সঙ্গে দেখা হয়নি। চলুন একবার ঘুরে আসি।'

'জায়গার নামটা মনে আছে?'

'ধরমপুর।'

'আর মহারাজার নাম?'

'সূরয সিং।'

আমরা লালমোহনবাবুর গাড়িতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিধু জ্যাঠার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। জ্যাঠা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে একটা পুরনো পুঁথি পরীক্ষা করছিলেন, আমাদের দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তোমরা কে? তোমাদের ত আমি চিনি না।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'অপরাধ নেবেন না জ্যাঠা। পসারটা একটু বেড়েছে বলে আর লোকজনের বাড়িতে বিশেষ যাওয়া হয় না। আমি যে কাজে উন্নতি করছি তাতে আপনি নিশ্চয়ই খুশি।'

এবার সিধু জ্যাঠার মুখে হাসি ফুটল।

'ফেলু মিত্তির— তোমাকে কি আমি আজ থেকে চিনি? আট বছর বয়সে এয়ার গান দিয়ে শালিক মেরে এনে আমায় দেখিয়েছিলে। আমি বলেছিলাম নিরীহ জীবকে আর কক্ষনো মারবে না— কথা দাও। তুমি সেদিন থেকে পাখি মারা বন্ধ করেছিলে। গোয়েন্দাগিরিতে পসার হচ্ছে বলে আমার কাছে বড়াই কোর না। গোয়েন্দা আমিও হতে পারতাম। তার সব গুণই আমার ছিল। এখনও আছে। তবে কোনোরকম কাজে বাঁধা পড়া আমার ধাতে সয় না। আমার সময় যদি আমি নিজে ইচ্ছামতো ব্যয় না করতে পারি তা হলে লাভটা কী? শার্লক হোম্‌সের এক দাদা ছিল জানতে? মাইক্রফ্‌ট হোম্‌স। জাত কুঁড়ে, কিন্তু বুদ্ধিতে সত্যিই শার্লকের দাদা। সেই দাদার কাছে শার্লক মাঝে মাঝে যেতো পরামর্শ নিতে। আমি হচ্ছি সেই মাইক্রফ্‌ট। যাক্ গে, এখন বল কি জন্যে আগমন?'

'একজন লোক সম্বন্ধে আপনার কাছে কোনো ইনফরমেশন আছে কিনা জানতে এসেছিলাম।'

'কে সেই ব্যক্তি?'

'আপনি ধরমপুরের নাম শুনেছেন?'

'শুনব না কেন? উত্তরপ্রদেশের একটা করদ রাজ্য ছিল। আলিগড় থেকে সাতাত্তর মাইল দক্ষিণে। ট্রেন নেই, গাড়িতে যেতে হয়।'

'তা হলে সূরয সিং-এর সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই জানেন?'

'ওরে বাবা!—সে কি এখনও বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে যে একটি আস্ত বাঘ। মালটি মিলিওনেয়ার। হোটেলের ব্যবসার টাকা। হীরে জহরতের অত ভালো কালেকশন ভারতবর্ষে আর কারুর নেই।'

'লোক কেমন জানেন?'

'তা কী করে জানব? সে কি আমার এই কুটিরে পদার্পণ করেছে, না আমি তার বাড়ি গেছি? এসব লোককে ভালো-খারাপ বলে বর্ণনা করা যায় না। তুমি হয়ত গিয়ে দেখলে তার মতো অতিথিবৎসল লোক আর হয় না— তোমাকে রাজার হালে রেখে দিল। আবার পরদিন হয়ত সেই লোকই তার কালেকশনের জন্য পাথর আদায় করতে একজনকে খুনই করে ফেলল। অবশ্য নিজে হাতে নয়; এরা সব সময় আইন বাঁচিয়ে চলে, যদিও তার জন্য ট্যাঁক খরচা হয় অনেক।'

এই খবরই যথেষ্ট বলে আমরা সিধু জ্যাঠাকে আর বিরক্ত করলাম না, যদিও সূরয সিং-এর সঙ্গে আমাদের কারবার হচ্ছে কীভাবে সেটা এখনো বুঝতে পারলাম না। ফেলুদাকে বলতে ও বলল, 'তাও এ খবরগুলো জেনে রাখা ভালো। সে লোক যখন বড়ালকে চিঠি লিখেছে তখনই বোঝা যাচ্ছে তার মুক্তোটার বিশেষ দরকার। সেটা পাবার জন্য সে কতদূর যেতে পারে সেইটে দেখার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে।'

॥ ৬ ॥

মগনলাল বিষ্যুদবার পর্যন্ত টাইম দিয়েছিল ফেলুদা তার মধ্যে ওর সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করল না। আর বিস্ফোরণটা হল শুক্রবার সকালে।

আমিও ফেলুদার দেখাদেখি রোজ সকালে যোগব্যায়াম করি। সাড়ে ছ'টায় সে ব্যাপার শেষ হয়েছে। ফেলুদার কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না দেখে আমি তার ঘরের দিকে গেলাম। দরজাটা ভেজানো ছিল। ঠেলে খুলতেই একটা দৃশ্য দেখে থ মেরে গেলাম।

ফেলুদা এখনো ঘুমোচ্ছে। এ যে অভাবনীয় ব্যাপার! এই সময়ের মধ্যে ফেলুদার স্নান ব্যায়াম দাড়ি কামানো সব শেষ হয়ে যায়। সে বসবার ঘরে খবরের কাগজ পড়ে। আজ কী হল?

আমি ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলাম। বার দু-এক ঠেলা দিয়ে আর নাম ধরে ডেকে বুঝতে পারলাম ওর হুঁশ নেই।

আমার দৃষ্টি গোদরেজের আলমারির দিকে চলে গেল। দরজা হাট হয়ে আছে। সামনে মেঝেতে জিনিসপত্র ছড়ানো।

ফেলুদার পাল্‌স দেখলাম। দিব্যি চলছে। দৌড়ে বসবার ঘরে গিয়ে আমাদের ডাক্তার ভৌমিককে টেলিফোন করে ব্যাপারটা বললাম। ভদ্রলোক দশ মিনিটের মধ্যে চলে এলেন। ফেলুদাকে যখন পরীক্ষা করছেন তখনই ও নড়াচড়া আরম্ভ করেছে। ভৌমিক বললেন, 'ক্লোরোফর্ম জাতীয় কিছু ব্যবহার করা

হয়েছে অজ্ঞান করার জন্য। কিন্তু লোক ঘরে ঢুকল কী করে ?'

সেটা আমি দু' মিনিটের মধ্যে বার করে দিলাম। বাথরুমের উত্তর দিকে জমাদার ঢোকার দরজাটা খোলা।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফেলুদার জ্ঞান হল। ডাক্তার ভৌমিক ভরসা দিয়ে বললেন, 'কোনো চিন্তা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবেন। তবে এরা কী ক্ষতি করেছে সেটা একবার দেখে নিন। আলমারি ত দেখছি খোলা।'

'তোপ্‌শে দেরাজটা একবার খুলে দেখ ত।'

দেখলাম, কিন্তু সেই লাল ভেলভেটের কৌটো কোথাও পেলাম না। অর্থাৎ পিংক পার্ল উধাও।

ফেলুদা মাথা নেড়ে আক্ষেপের সুরে বলল, 'বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে আমার কোনোদিন ভুল হয় না। কালও হয়নি। আসলে ছিটকিনিটা ভালো কাজ করছিল না। কেন যে সারিয়ে নিইনি— কেন যে সারিয়ে নিইনি !'

ডাক্তার ভৌমিক চলে গেলেন।

আমি ফেলুদার অবস্থা দেখেই লালমোহনবাবুকে ফোন করে দিয়েছিলাম। উনি এবার এসে পড়লেন।

'পিংক পার্ল নেই ?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। আমি বললাম, 'না।' ভদ্রলোক ফেলুদাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমাকে হেলাফেলা করার রেজাল্টটা দেখলেন ত ? আমি প্রথমেই বলেছিলাম— কাজটা ভালো হচ্ছে না। আপনার যে এই দশা করতে পারে সে লোক কী সাংঘাতিক ভেবে দেখুন। এখন কী করা ?'

ফেলুদা উঠে বসে চা খাচ্ছিল। বলল সে এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট। 'বড়ালকে দুঃসংবাদটা এখনো দেব না। আগে দেখি মুক্তোটা উদ্ধার করতে পারি কিনা।'

টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি তুলে কথা বলে সেটা ফেলুদার হাতে চালান করে দিলাম। 'তোমার ফোন।'

ফেলুদা মিনিট তিনেক কথা বলে ফোনটা রেখে বলল, 'সোনাহাটি থেকে সোমেশ্বর। বড়ালের খবর আছে। সূরয সিং আবার চিঠি লিখেছে। মুক্তো তার চাই। সে সাত দিনের জন্য দিল্লি যাচ্ছে, সেখান থেকে ফিরে সোনাহাটি গিয়ে বড়ালের সঙ্গে দেখা করবে। সে এক লাখ টাকা অফার করছে। এত টাকা পাবে বড়াল ভাবেনি। সে এখন মুক্তোটা বেচে দেবার কথা ভাবছে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে মুক্তোটা এখন ওর একটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলছে আপদ বিদেয় করাই ভালো। আমি আর বললাম না যে মুক্তোটা মগনলালের হাতে চলে গেছে।'

'কিন্তু সেটা ত উদ্ধার করতে হবে,' বললেন লালমোহনবাবু।

'তা ত হবেই। সেটাই এখন আমাদের কাজ। তোপ্‌শে টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে মগনলালের ঠিকানাটা বার করত।'

'সাতষট্টি নম্বর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ,' বই খুলে নম্বর দেখে বললাম।

'চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব,' বলল ফেলুদা।

'এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ করছেন ত ?' জিগ্যেস করলেন জটায়ু।

'ইয়েস স্যার।'

'পুলিশে খবর দেবেন না ?'

'কী লাভ ? তারা ত অনুসন্ধান করে নতুন কিছু বলতে পারবে না। সবই ত আমার জানা।'

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে মগনলালের বাড়ি যখন পৌঁছলাম, তখন বেজেছে ন'টা দশ। আমরা ভিতরে ঢুকছি আর লালমোহনবাবু বিড়বিড় করছেন— 'আজ আবার কী খেল দেখাবে কে জানে !'

কিন্তু তিনতলায় মগনলালের গদিতে পৌঁছে তাকে পাওয়া গেল না। তারই একজন কর্মচারী বলল, মগনলাল সকালে দিল্লি চলে গেছেন।

'প্লেনে গেছেন ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'না, ট্রেন।'

আমরা আবার নিচে নেমে এলাম। লালমোহনবাবু বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার ইনিও দিল্লি গেছেন আর ওদিকে সূরয সিংও দিল্লি গেছেন।'

'ব্যাপারটা ভেরিফাই করতে হবে,' বলল ফেলুদা।

চতুর্দিকে ফেলুদার চেনা— রেলওয়ে আপিসেও বাদ নেই। অপরেশবাবু বলে বুকিং-এর এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে ফেলুদা জিগ্যেস করল, 'আজ সকালে দিল্লির কী কী ট্রেন আছে ?'

'সোয়া ন'টায় আছে— এইট্টি ওয়ান। পরদিন সকালে দশটা চল্লিশে দিল্লি পৌঁছায়।'

'এ ছাড়া আর কিছু নেই ?'

'না।'

'এবার রিজার্ভেশন চার্টটা দেখে বলুন ত মিস্টার মেঘরাজ বলে এক ভদ্রলোক এই ট্রেনে দিল্লি গেছেন কিনা।'

ভদ্রলোক চার্টের নামের উপর চোখ বুলিয়ে এক জায়গায় থেমে বললেন, 'মিস্টার এম. মেঘরাজ। ফার্স্ট ক্লাস এ. সি.। কিন্তু ইনি ত দিল্লি যাননি।'

'তা হলে ?'

'বেনারস। বেনারস গেছেন। আজ রাত সাড়ে দশটায় পৌঁছবেন।'

'বেনারস ?'

কথাটা শুনে আমারও আশ্চর্য

লাগছিল, তবে এটা ত জানি যে মগনলালের বেনারসেও একটা বাড়ি রয়েছে। সেখানেই ত আমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ।

'কাল সকালের দিকে বেনারস পৌঁছায় এমন কী কী ট্রেন আছে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আপনি দুটো সুবিধের ট্রেন পাবেন একটা অমৃতসর মেল, আর একটা ডুন এক্সপ্রেস। প্রথমটা ছাড়ে সন্ধ্যা সাতটা কুড়ি আর বেনারস পৌঁছায় পরদিন সকাল দশটা পাঁচ, আর অন্যটা ছাড়ে রাত আটটা পাঁচ আর পৌঁছায় সকাল এগারোটা পনেরো।'

ফেলুদা না হলে অবিশ্যি আমাদের রিজার্ভেশন পাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। সঙ্গে টাকা ছিল না। তাই বাড়ি ফিরতে হল। আবার রেল আপিসে ফিরে গিয়ে বারোটার মধ্যে রিজার্ভেশন হয়ে গেল। লালমোহনবাবু চলে গেলেন তাঁর বাড়িতে বাক্স গুছাতে। ফেলুদা বলে দিল, 'ক'দিনের জন্য যাচ্ছি কিছু ঠিক নেই মশাই। আপনি এক হপ্তার মতো জামাকাপড় নিয়ে নিন। ওদিকে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা— সেটা ভুলবেন না।'

ট্রেনে বলবার মতো একটা ঘটনাই হল। পরদিন সকালে সাড়ে সাতটায় বক্সারে খবরের কাগজ কিনে তাতে একটা জরুরি খবর পড়লাম। আমেরিকা থেকে একটা ব্যবসায়ীদের দল এসেছে, তারা যেসব ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে তার মধ্যে সূরয সিং একজন। ভদ্রলোকের দিল্লি যাবার কারণটা বোঝা গেল।

মিনিটে পনেরো লেট করে আমাদের ট্রেন বেনারস পৌঁছে গেল।

॥ ৭ ॥

বেনারসে দ্বিতীয়বার এসেও সেই প্রথমবারের মতোই চমক লাগল। এবারও দশাশ্বমেধ রোডে ক্যালকাটা লজেই উঠলাম। ম্যানেজারও একই রয়েছেন— নিরঞ্জনবাবু। ঘর আছে কিনা জিগ্যেস করতে বললেন, 'আপনাদের জন্য ঘর সব সময়ই আছে। ক'দিন থাকবেন?'

'সেটা আগে থেকে বলতে পারছি না,' বলল ফেলুদা।

আমরা আগেরবারের মতোই একটা চার বেডের ঘর পেয়ে গেলাম।

ব্রেকফাস্ট বক্সারেই সারা হয়ে গিয়েছিল, তাই খাবার তাড়া নেই। ফেলুদা বলল, 'আগে কর্তব্যটা সেরে নিই, তারপর খাবার কথা ভাবা যাবে।'

'আপনি কি একেবারে বাঘের খাঁচায় গিয়ে ঢোকার কথা ভাবছেন?' লালমোহনবাবু চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন।

'আপনি যদি হোটেলে থাকতে চান ত থাকতে পারেন।'

'না না, সে কি হয়? থ্রী মাস্কেটিয়ার্স— ভুলে গেলে চলবে কেন?'

মগনলালের বাড়ি বিশ্বনাথের গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। আমরা বারোটা নাগাদ রওনা দিয়ে দিলাম। আবার সেই দৃশ্য, সেই শব্দ, সেই গন্ধ। মনে হল এই ক'বছরে একটুও বদল হয়নি, আর কোনোদিনও হবে না। কয়েকজন দোকানদারের মুখও যেন চিনতে পারলাম।

ক্রমে মন্দির ছাড়িয়ে আমরা গলির একটা মোটামুটি নিরিবিলি অংশে পৌঁছে গেলাম। সব মনে পড়ছে। এর পরে ডাইনে ঘুরতে হবে, তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়েই আমরা পৌঁছে যাবো মগনলালের বাড়ির রাস্তায়।

'আপনি কী বলবেন সেটা ঠিক করে নিয়েছেন?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'আমি যে সব সময় আগে থেকে ভেবে কাজ করি তা নয়। একেকটা বিশেষ মুহূর্তে একেকটা বিশেষ আইডিয়া এসে যায়। তখন সেইটে প্রয়োগ করি।'

'এর বেলাও তাই করবেন?'

'সেই রকমই ত ইচ্ছে আছে।'

মগনলালের বাড়ির সদর দরজার দু'পাশে এখনো তলোয়ারধারী দুই প্রহরীর ছবি, এই ক'বছরে রঙটা একটু ফিকে হয়ে গেছে।

আমরা দরজা দিয়ে ঢুকে একতলার উঠোনে পৌঁছলাম। কেউ কোথাও নেই। দু'বার 'কোই হ্যায়' বলেও ফেলুদা জবাব পেল না।

'চলুন উপরে,' বলল ফেলুদা। 'লোকটার সঙ্গে যখন দেখা করতেই হচ্ছে, তখন নিচে দাঁড়িয়ে থেকে ত কোনো লাভ নেই।'

আবার সেই ছেচল্লিশ ধাপ সিঁড়ি, আবার সেই তিন তলায়।

দরজা দিয়ে বারান্দায় ঢুকতে একজন লোক সামনে পড়ল। সে খৈনি ডলছিল, আমাদের দেখে একটু অবাক হয়ে হিন্দিতে প্রশ্ন করল, 'আপনারা কাকে চাইছেন?'

'মগনলালজী আছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আছেন, তবে উনি এখন খেতে বসেছেন। আপনারা ওঁর ঘরে অপেক্ষা করুন। চলুন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।'

আমরা আবার অনেকদিন পরে মগনলালের ঘরে এসে ঢুকলাম। এই ঘরেই লালমোহনবাবুকে নাকাল করেছিলেন ভদ্রলোক। সে ঘটনা কোনোদিনও ভুলব না। লালমোহনবাবুকে নিয়ে রগড় করার একটা বাতিক লোকটার মজ্জাগত।

কাঠমাণ্ডুতেও লালমোহনবাবুর চায়ে এল. এস. ডি. মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে অবিশ্যি লালমোহনবাবুর খুব ক্ষতি হয়নি, কিন্তু হবার সম্ভাবনা ছিল পুরোমাত্রায়।

আমরা তিনজন সোফায় বসার পরেই জটায়ু চাপা স্বরে বললেন, 'কী বলবেন ঠিক করে ফেলুন মশাই। এইবেলা ঠিক করে ফেলুন। আমার মাথায় ত কিছুই আসছে না।'

'আপনার মাথা দিয়ে ত আর এ মামলা চালাচ্ছি না আমি। আপনি চুপচাপ দেখে যান।'

'ইয়েটা সঙ্গে আছে?'

ইয়ে মানে ফেলুদার রিভলভার সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

'আছে। নার্ভটাকে ঠাণ্ডা করুন। এসব সিচুয়েশনে সঙ্গে একজন নার্ভাস লোক থাকলে বড় অসুবিধা হয়।'

কোত্থেকে যেন একটা ঢোলকের শব্দ আসছে, ঘরের দেয়াল-ঘড়ি টিক্ টিক্ করছে, নাকে রান্নার গন্ধ এসে ঢুকছে, আমরা চুপচাপ বসেই আছি ত বসেই

আছি।

'একটা লোকের খেতে এত সময় লাগে?' বিড়বিড় করে বললেন লালমোহনবাবু।

কথাটা বলার মিনিট খানেকের মধ্যে একজন লোক এসে ঘরে ঢুকল। সে যে মুগুর ভাঁজা পালোয়ান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে ফেলুদার সামনে গিয়ে বলল, 'খাড়া হো জাইয়ে।'

'কিঁউ?' ফেলুদার প্রশ্ন।

'সার্চ হোগা।'

'কে হুকুম দিয়েছে তোমায়?'

'মালিক।'

'মগনলালজী?'

'হাঁ।'

ফেলুদা তবু বসে আছে দেখে লোকটা তার দু'হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে অনায়াসে তাকে দাঁড় করালো। ফেলুদা আর কোনো আপত্তি করল না, কারণ এ লোকটার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে ওঠা পাঁচটা ফেলুদারও সাধ্যি নেই।

লোকটা চাপড় মেরে প্রথমেই ফেলুদার রিভলভারটা বার করল। তারপর মানি ব্যাগ আর রুমাল।

এবার ফেলুদাকে ছেড়ে লোকটা লালমোহনবাবুকে ধরল। লালমোহনবাবু অবিশ্যি ফেলুদার সার্চ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছেন হাত মাথার উপর তুলে।

আমাদের তিনজনের সার্চ শেষ হবার পর লোকটা রিভলভার ছাড়া আর সব কিছু ফেরত দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপরেই বাইরে থেকে একটা গলা খাঁকরানির আওয়াজ পেলাম। এ আমাদের খুব চেনা গলা।

'এ ভাবে আমার পিছে লাগলেন কেন, মিস্টার মিটার?' গদিতে বসে মগনলাল প্রশ্ন করলেন। 'আপনার এখুনো শিকষা হয়নি? কী লাভ আছে আমার পিছে পিছে ঘুরে? আপনি ত সে মোতি আর ফিরত পাবেন না।'

'আপনি নিজেকে খুব চালাক মনে করেন— তাই না, মগনলালজী?'

'সে ত আপনিও করেন। বুদ্ধি না থাকলে আর এতদিন বেওসা চালাচ্ছি? বুদ্ধি না থাকলে আর আপনার ঘর থেকে মোতি বার করে আনতে পারি?'

'কী মোতি?'

'পিংক পার্ল!' মগনলাল চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কী মোতি সেও কি আপনাকে বলে দিতে হবে?'

'কে বলল পিংক পার্ল?' ধীর কণ্ঠে বললি ফেলুদা। 'ইট্‌স এ হোয়াইট পার্ল। তাও খাঁটি মুক্তো নয়, কালচারড পার্ল— যার দাম অনেক কম। আপনাকে ভাঁওতা দেবার জন্য ওতে পিংক রং করা হয়েছে। আসল মুক্তো চলে গেছে যার জিনিস তার কাছে। অত বেশি বুদ্ধিমান ভাববেন না নিজেকে, মগনলালজী।'

আমি অবাক হয়ে ফেলুদার কথা শুনছি। ও কী করে এত সব বানিয়ে বানিয়ে বলছে? কোত্থেকে ওর এত সাহস হচ্ছে? লালমোহনবাবু দেখলাম মাথা হেঁট করে রয়েছেন।

'আপনি সচ্ বলছেন?'

'আপনি কীভাবে যাচাই করতে চান করে দেখুন।'

মগনলাল তার সামনে রাখা একটা রুপোলি কলিং বেলে চাপড় মারলেন। পর মুহূর্তেই সেই পালোয়ান লোকটা আবার এসে ঢুকল।

'সুন্দরলালের দোকান থেকে ওকে ডেকে আনো। বলো মগনলালজী ডাকছেন। তুরন্ত্।' ভৃত্য চলে গেল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ। মগনলাল একটা পানের ডিবে থেকে পান নিয়ে মুখে পুরলেন। তারপর ডিবে বন্ধ করার সময় একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন।

'রবীন্দরনাথ টেগোরের গান আপনি জানেন?'

এবার মগনলালের চাউনি থেকে বুঝলাম প্রশ্নটা করা হয়েছে জটায়ুকে।

'কী আঙ্কল? জবাব দিচ্ছেন না কেন? আপনি বাঙালি আর আপনি টেগোর সং জানেন না?'

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে না বোঝালেন।

'সচ্ বোলছেন?'

এবারে মাথা নড়ল উপর-নিচে। অর্থাৎ হ্যাঁ। ভদ্রলোক এখনও মাথা তুলতে পারছেন না।

এবার ফেলুদা বলল, 'উনি গান করেন না, মগনলালজী।'

'করেন না ত কী হল? এখুন করবেন। দশ মিনিট লাগবে সুন্দরলালের এখানে আসতে। সেই টাইমে টেগোর সং হবে। আঙ্কল উইল সিং। আসুন আঙ্কল— গদিপর বসুন। সোফায় বসে কি গান হয়? গেট আপ, গেট আপ! না গাইবেন ত বড় মুশকিল হবে।'

'আপনি বার বার ওঁকে নিয়ে এমন তামাসা করেন কেন বলুন ত?' বেশ রেগে গিয়েই বলল ফেলুদা। 'উনি আপনার কী ক্ষতি করেছেন?'

'নাথিং। দ্যাট ইজ হোয়াই আই লাইক হিম। উঠুন আঙ্কল। উঠুন, উঠুন!'

নিরুপায় হয়ে লালমোহনবাবু সোফা ছেড়ে উঠে গদিতে বসলেন।

'ভেরি গুড। নাউ সিং।'

আর কোনোই রাস্তা নেই। তাই ভদ্রলোক সত্যিই গান ধরলেন। 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।'

মগনলাল তাকিয়ায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে পাশে রাখা ক্যাশবাক্সের উপর তাল ঠুকে তারিফ করতে লাগলেন। এই অদ্ভুত গানের তারিফ হতে পারে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রায় পাঁচ মিনিট একটানা গেয়ে লালমোহনবাবু আর পারলেন না। বললেন, 'বাকিটা জানি না।'

'দ্যাট ইজ এনাফ,' বললেন মগনলাল। 'এবার সোফায় গিয়ে বসুন।'

লালমোহনবাবু সোফায় বসতেই ঘরে লোকের প্রবেশ হল— সেই পালোয়ান চাকর, আর একজন পুরু চশমাপরা বুড়ো।

'আইয়ে সুন্দরলালজী,' বললেন মগনলাল। 'আপনি এত বুঢ়্ঢা হুয়ে গেছেন এই ক'বছরে তা ভাবতে পারিনি। একটা কাজের জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

সুন্দরলাল গদিতে বসলেন। মগনলাল তাঁর ক্যাশবাক্স খুলে তার থেকে ভেলভেটের বাক্সটা বার করলেন। তারপর বাক্স থেকে মোতিটা বার করে সুন্দরলালকে প্রশ্ন করলেন, 'গুলাবী মোতি হয় সেটা আপনি জানেন?'

'গুলাবী মোতি?'

'হা।'

'সেরকম ত শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি।'

'আপনি পঞ্চাশ বছর হল দোকান চালাচ্ছেন আর গুলাবী মোতি চোখে দেখেননি? দেখুন এইটে দেখুন। দেখে বলুন ত এটা সচ্চা না ঝুঠা?'

সুন্দরলাল মুক্তোটা হাতে নিলেন। দেখলাম তাঁর হাত কাঁপছে। চোখের খুব কাছে এনে মুক্তোটাকে মিনিটখানেক ধরে দেখে সুন্দরলাল বললেন, 'হাঁ, এতো সত্যিই দেখছি গুলাবী মোতি। অ্যায়সা কভী নেহি দেখা।'

'তা হলে এটা খাঁটি?'

'ওইসাই তো মালুম হোতা।'

'এবার মোতিটা দিয়ে দিন আমাকে।'

সুন্দরলাল মুক্তোটা ফেরত দিয়ে দিল।

'এবার আপনি যেতে পারেন।'

সুন্দরলাল ঘর থেকে বেরোনর পর মগনলাল ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি ঝুট বাত বলেছেন, মিস্টার মিটার। এই পার্ল জেনুইন।'

'এটা কি আপনি সূরয সিংকে বিক্রি করতে চান?'

'আমি কী করি না-করি তাতে আপনার কী?'

'আপনি ত এখান থেকে দিল্লি যাবেন?'

'হাঁ, যাবো।'

'ওখানে ত সূরয সিং রয়েছেন।'

'সে খবর আমি পেপারে পড়েছি।'

'আপনি কি বলতে চান তাঁর সঙ্গে আপনার কোনো কারবার নেই?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না, মিস্টার মিটার। দ্য পিংক পার্ল চ্যাপটার ইজ ক্লোজড। আমি ওই নিয়ে আপনার সঙ্গে আর কোনো কথা বলব না।'

'ঠিক আছে, আমি উঠছি। আমার যে জিনিসটা আপনার কাছে রয়েছে সেটা দয়া করে ফেরত দিন।'

মগনলাল আবার কলিং বেল টিপলেন। পালোয়ান এসে দাঁড়াল।

'এঁকে এর রিভলভার ওয়াপিস দিয়ে দাও।'

পালোয়ান আজ্ঞা পালন করল, ফেলুদা আর আমরা দু'জন উঠে

পড়লাম।

মগনলালের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে লালমোহনবাবুকে জিগ্যেস করলাম, 'এখন কেমন লাগছে?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'লোকটা কী করে যে একটা মানুষের উইক পয়েন্ট ধরে ফেলে!—পাঁচ মিনিট ধরে একটানা রবীন্দ্রসংগীত জীবনে এই প্রথম গাইলাম।'

একতলায় এসে ফেলুদা বলল, 'আজকে যে একটা খুব জরুরি কাজ হয়ে গেল সেটা কি বুঝতে পেরেছেন, লালমোহনবাবু?'

'জরুরি কাজ?' ভদ্রলোক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'ইয়েস স্যার,' বলল ফেলুদা। 'জেনে গেলাম ও মুক্তোটা কোথায় রাখে।'

'আপনি কি ওটা আবার আদায় করার তাল করছেন?'

'ন্যাচারেলি?'

॥ ৮ ॥

হোটেলে ফিরে ঘরে ঢোকার আগেই নিরঞ্জনবাবু তাঁর ঘর থেকে ডাক দিয়ে বললেন, 'একটি ভদ্রলোক আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন।'

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে দেখি একটি মাঝারি হাইটের কালো ভদ্রলোক, বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ, ম্যানেজারের উলটো দিকে একটা চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের দেখে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার নাম মতিলাল বড়াল।'

'আপনি কি জয়চাঁদবাবুর ভাই?'

'খুড়তুতো ভাই। এখানে একটা সিনেমা হাউস আছে আমার।'

'চলুন, আমাদের ঘরে চলুন। কথা হবে।'

আমরা চারজন আমাদের ঘরে এলাম। খাটে বসে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'মুক্তোটা এখন কোথায়? জয়চাঁদের কাছে?'

'না।'

'তবে?'

'মগনলাল মেঘরাজের নাম শুনেছেন?'

'বাবা! তেইশ বছর কাশীতে আছি, আর মগনলালের নাম শুনব না?'

'মুক্তোটা তাঁরই কাছে আছে।'

'কিন্তু তিনি ত মুক্তো জমান না। তিনি ত দালাল; কম দামে জিনিস কিনে বেশি দামে বেচেন।'

'এবারেও তাই করবেন। ধরমপুরের সূরয সিংকে উনি মুক্তোটা বেচবেন।'

'সূরয সিং এখানে আসছেন?'

'না। উনি দিল্লিতে। আমার যতদূর ধারণা, মগনলাল দিল্লি যাচ্ছেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।'

'আপনি কী করছেন?'

'আমরাও দিল্লি যাবো—যদি তার আগে মুক্তোটা আদায় করতে পারি।'

'মগনলাল যদি টাকা না পায়, তা হলে আমার ভাই পাবে ত?'

'সূরয সিং যদি তাঁর কথা রাখেন তা হলে নিশ্চয়ই পাবেন।'

'আশ্চর্য! এমন একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস ফ্যামিলিতে রয়েছে এতকাল ধরে,

আর জয় সে কথা একবারও বলেনি। ও একাই জিনিসটাকে আগলে রেখেছে।'

'আপনি জানতেন না এতে আমার খুব অবাক লাগছে।'

'আমি পনেরো বছর বয়স থেকে ঘর ছাড়া। তারপর আর সোনাহাটি যাইনি। কাগজে মুক্তোর কথাটা পড়ে জয়কে চিঠি লিখেছিলাম, যে বিক্রি যদি হয় তা হলে আমি যেন একটা শেয়ার পাই। ও লিখল আমি বিক্রি করব না। তারপর কাল একটা চিঠি পেয়েছি তাতে লিখেছে ও মাইন্ড চেঞ্জ করেছে, বিক্রি করবে। এই যে সেই চিঠি।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে দিলেন। ফেলুদা সেটা পড়ে ফেরত দিয়ে বলল, 'আপনাকে ত বিশ হাজার অফার করেছে, আপনি তাতে সন্তুষ্ট ?'

'আরেকটু বেশি হলে আরো খুশি হতাম, তবে নেই-মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। মুক্তোটা যে মগনলালের কাছে আছে সে বিষয়ে আপনি শিওর ?'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

মতিলালবাবু একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনি যদি মুক্তোটা চান, তা হলে ত আপনিই সেটা সুরয সিংকে বিক্রি করবেন ?'

'তা ত বটেই, এবং তা হলেই আপনি আপনার শেয়ার পাবেন।'

'তা হলে প্রথম কাজ হচ্ছে মগনলালের কাছ থেকে মুক্তোটা আদায় করা।'

'সে ব্যাপারে আপনি আমাকে হেল্প করতে পারেন ?'

'আপনার কী দরকার ?'

'বেপরোয়া কাজ করতে পারে এমন কিছু লোক।'

মতিলালবাবু কয়েক মুহূর্ত মাথা হেঁট করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'একটা কথা আপনাকে বলি, মিস্টার মিত্তির—আজকাল শুধু সিনেমা হাউস চালিয়ে সংসার চলে না। লোকেরা সব বাড়িতে বসে ছবি দেখে। তাই কিছু একস্ট্রা রোজগারের রাস্তা দেখতে হয়।'

'মানে গোলমেলে কাজ ?'

'কিন্তু আইন বাঁচিয়ে।'

'তার মানে আপনার হাতে লোক আছে ?'

'মগনলালের যে রাইট-হ্যান্ড ম্যান—মনোহর—সে আমার দিকে চলে এসেছে। তা ছাড়া আরো দু-একজন লোক আমি দিতে পারি।'

'ভেরি গুড।'

'আপনি বলুন কখন কী করতে হবে।'

'আজ রাত বারোটা। জ্ঞান-বাপীতে চলে আসুন আপনার লোক নিয়ে। আমরা ওখানে থাকব।'

'ঠিক আছে। রাত বারোটা।'

'আপনি আবার গোঁয়ার্তুমি করছেন ?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা তাতে কানই দিল না। সে মতিলালবাবুকে বলল, 'মগনলালের কিন্তু একটি পালোয়ান ভৃত্য আছে। তার সঙ্গে মোকাবিলা করার কথাটা ভুললে চলবে না।'

মতিলালবাবু হেসে বললেন, 'আমার মনোহরও পালোয়ান। তার উপরে মাথায় বুদ্ধি রাখে।'

'তা হলে ওই কথা রইল। রাত বারোটা, জ্ঞান-বাপী।'

মতিলালবাবু উঠে পড়ে বললেন, 'একটা জরুরি কথা জিগ্যেস করা হয়নি। মুক্তোটা ও কোথায় রাখে জানেন ?'

'জানি। ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

'অল রাইট।'

ভদ্রলোক চলে গেলে ফেলুদাও বিছানা থেকে উঠে পড়ে বলল, 'আমার নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দু' মিনিট দরকার আছে। সেটা সেরে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা সারা যাবে। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে।'

॥ ৯ ॥

কাশীর মতো থমথমে রাত খুব কম জায়গাতেই দেখেছি। সেটা আরো বেশি মনে হয় এই জন্যে যে দিনের বেলা জায়গাটা লোকে জনে রঙে শব্দে ভরে থাকে। আমরা বারোটার সময় যখন জ্ঞান-বাপী পৌঁছলাম তখন একটা রাস্তার কুকুরের ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর ফেলুদা একটা শেষ-করা চারমিনার পায়ের তলায় ফেলে চাপ দিতেই চাপা গলায় শোনা গেল, 'মিস্টার মিত্তির!' বুঝলাম মতিলাল বড়াল হাজির।

কতগুলো অন্ধকার মূর্তি আমাদের দিকে এগিয়ে এল। 'আমার সঙ্গে তিনজন লোক আছে। আপনি রওনা দেবার জন্য তৈরি ?'

চাপা স্বরে প্রায় ফিসফিসিয়ে কথা

হচ্ছে। ফেলুদাও সেইভাবেই বলল, 'নিশ্চয়ই। আর, আমাদের গাইড করতে হবে না, আমরা রাস্তা জানি।'

'তা হলে চলুন।'

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ফেলুদা আর মতিলালবাবু দু'জনেই দেখলাম রাস্তা খুব ভালো করে জানে, আর এই ঘুটঘুটে অন্ধকারেও বেশ দ্রুতই এগিয়ে চলেছে। এক জায়গায় একটা রাস্তার আলো টিমটিম করে জ্বলছিল। সেই আলোতে দেখে নিয়েছি মতিলালবাবুর তিনজন লোকের মধ্যে একজন ভীষণ ষণ্ডা। বুঝলাম এই হচ্ছে মনোহর।

মগনলালের রাস্তার মুখে এসে সকলে থামল। ফেলুদা লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন। আমাদের হয়ত মিনিট কুড়ি লাগবে।'

কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই মতিলালবাবু আর ওই তিনজন লোকের সঙ্গে ফেলুদা মগনলালের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট দু'জনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজেদের নিশ্বাস ফেলার শব্দ পাচ্ছি। অবশেষে লালমোহনবাবু হয়ত আর থাকতে না পেরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে তোমার দাদার যাবার কী দরকার ছিল বুঝতে পারলাম না।'

'সেটা যথাসময়ে বুঝবেন।'

'আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।'

'ঠিক আছে। আমার মনে হয় কথা না বলাই ভালো।'

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। খুব মন দিয়ে শুনলে দূর থেকে হারমোনিয়াম আর ঘুঙুরের শব্দ পাওয়া যায়। আকাশের দিকে চাইলাম। এত তারা কলকাতার আকাশে কোনোদিন দেখিনি। এই তারার আলোতেই চার পাশ আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। যতদূর মনে হয়, আজ অমাবস্যা।

বেশি সময় যায়নি, কিন্তু এখনই মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ হল? দশ মিনিট? পনের মিনিট? আশ্চর্য! মগনলালের বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে, এখান থেকে ত্রিশ হাত দূরে, কিন্তু তার কোনো শব্দ নেই।

আরো মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর পায়ের শব্দ পেলাম। একজনের বেশি লোক এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

ফেলুদারাই ফিরছে। কাছে এসে বলল, 'চ।'

'কাজ হল?' রুদ্ধশ্বাসে জিগ্যেস করলেন জটায়ু।

'খতম্,' বলল ফেলুদা। তারপর মতিলালবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। আপনার শেয়ারের ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

আমরা আমাদের হোটেলের দিকে হাঁটা দিলাম।

কথা হল একেবারে ঘরে ঢুকে।

'কিছু বলুন, মশাই!' আর থাকতে না পেরে বললেন লালমোহনবাবু।

'আগে এইটে দেখুন।'

ফেলুদা পকেট থেকে লাল ভেলভেটের বাক্সটা বার করে খাটের উপর রাখল।

'সাবাস!' বললেন লালমোহনবাবু। 'কিন্তু কীভাবে হল ব্যাপারটা একটু বলুন। খুন-খারাপি হয়নি ত?'

'সেই পালোয়ানটা মাথায় একটু চোট পেয়েছে, সেটা মনোহরের কীর্তি।'

'কিন্তু ক্যাশবাক্স খুললেন কি করে?'

'যে ভাবে লোকে খোলে। চাবি দিয়ে।'

'একি ম্যাজিক নাকি?'

'নো স্যার। মেডিসিন।'

'মানে?'

'সাপ্‌লাইড বাই নিরঞ্জনবাবুর বন্ধু ডাক্তার চৌধুরী।'

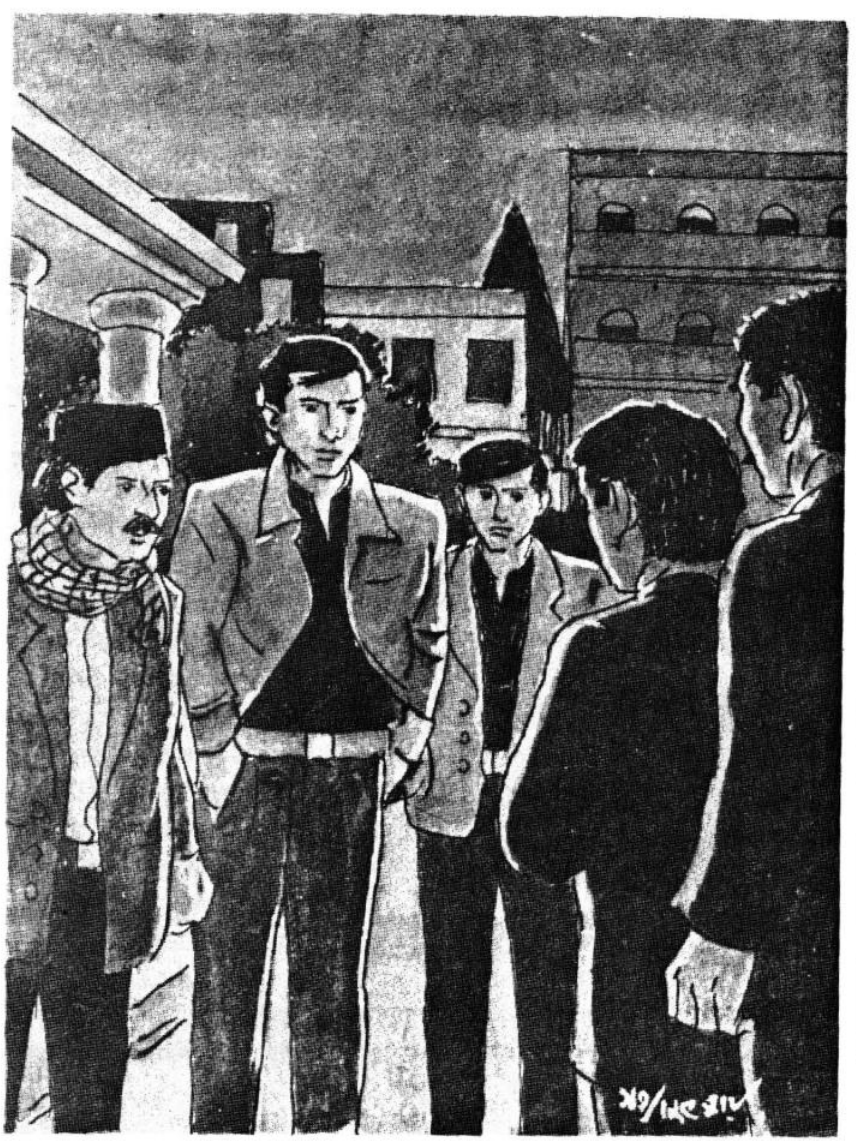

'কিসব বলছেন আবোল তাবোল ? কিসের সাপ্লাই ?'

'ক্লোরোফর্ম,' বলল ফেলুদা। 'শঠে শাঠ্যম্। এবার বুঝেছেন ?'

পরদিন রাত সোয়া এগারোটায় দিল্লি এক্সপ্রেস ধরে তারপর দিন ভোর ছ'টায় দিল্লি পৌঁছলাম। এর আগের বার আমরা জনপথ হোটেলে ছিলাম, এবারও তাই রইলাম। ফেলুদা ঘরে এসে আর কিছু করার আগে বিভিন্ন হোটেলে ফোন করে খোঁজ নিতে আরম্ভ করল সূরয সিং কোথায় আছে। দশ মিনিট চেষ্টা করার পর তাজ হোটেলে বলল, 'হ্যাঁ, সূরয সিং এখানেই আছেন। রুম থ্রী ফোর সেভ্ন।'

'একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি ?'

সৌভাগ্যক্রমে সূরয সিং তাঁর ঘরেই ছিলেন। এক মিনিটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল। সন্ধ্যা ছ'টা। হোটেলে ওঁর ঘরেই যেতে হবে। কী কারণ জিগ্যেস করেছিল, বলল ফেলুদা। 'আমি তাকে পিংক পার্ল সংক্রান্ত ব্যাপার বলাতে তৎক্ষণাৎ টাইম দিয়ে দিল।'

দুপুর বেলাটা কিছু করার নেই। জনপথে একটা চীনে রেস্টোরান্টে খেয়ে দোকানগুলো দেখে তিনটে নাগাত হোটেলে ফিরে এলাম একটু বিশ্রামের জন্য। পৌনে ছ'টায় বেরোতে হবে। লালমোহনবাবু ফেলুদাকে মনে করিয়ে দিলেন, 'আপনার ইয়েটা নিতে ভুলবেন না।'

ছ'টায় তাজে পৌঁছে ফেলুদা প্রথমে নিচ থেকে ফোন করে জানিয়ে দিল যে আমরা এসেছি।

'আমার ঘরে চলে আসুন,' বললেন ভদ্রলোক।

তিনশো সাতচল্লিশে গিয়ে বেল টিপতে যে দরজা খুলল তাকে মনে হল সেক্রেটারি জাতীয় কেউ। বললেন, 'আপনারা বসুন, উনি এক্ষুনি আসছেন।'

ঘর বলতে যা বোঝায় এটা তা নয়; তিনটে ঘর জুড়ে একটা বিশাল সুইট। যেটায় ঢুকেছি সেটা সিটিং রুম। আমরা সোফায় গিয়ে বসলাম।

মিনিট পাঁচেক বসতেই ভদ্রলোক এসে

পড়লেন।

ইনি যে অত্যন্ত ধনী সেটা এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়। গায়ে চোস্ত সুট, সোনার টাইপিন, পকেটে সোনার কলম। হাতে পাথর বসানো সোনার আংটি। বয়স পঞ্চান্নর বেশি নয়। কানের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে, বাকি চুল কালো, আর চাড়া দেওয়া গোঁফটাও কালো।

'হু ইজ মিস্টার মিটার ?'

ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারটা সেরে নিল। ভদ্রলোক দেখলাম দাঁড়িয়েই রইলেন।

'আপনার সঙ্গে পিংক পার্লের কী কানেকশন ?' ফেলুদাকে প্রশ্ন করলেন মিস্টার সিং।

ফেলুদা বলল, 'আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। জয়চাঁদ বড়াল মুক্তোটা আমার জিম্মায় রেখেছেন যাতে ওটা নিরাপদ থাকে।'

'কথাটা আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য নই, মিস্টার মিটার। আপনি মালিকের কাছ থেকে যে মুক্তোটা চুরি করেননি তার কী প্রমাণ ?'

'কোনো প্রমাণ নেই। আপনাকে আমার কথা মেনে নিতে হবে।'

'আমি তাতে রাজি নই।'

'তা হলে আমার একটা কথাই বলার আছে—আমি মুক্তোটা দেব না। এটা যাঁর জিনিস তাঁর কাছে ফেরত চলে যাবে।'

'মুক্তোটা দিতে আপনি বাধ্য।'

'না মিস্টার সিং, আমি বাধ্য নই। নো ওয়ান ক্যান ফোর্স মি।'

চোখের পলকে সূরয সিং-এর হাতে একটা রিভলভার চলে এল, আর তার পরমুহূর্তেই একটা কান-ফাটানো গর্জন।

কিন্তু সেটা সূরয সিং-এর রিভলভার থেকে নয়, ফেলুদার কোল্ট থেকে। সে সূরয সিং-এর হাত নামানো দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। আর বিদ্যুদ্বেগে নিজের রিভলভারটা বার করেছে।

গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সূরয সিং-এর হাত থেকে তার রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে একটা ঠং শব্দ করে ঘরের পিছন দিকের মেঝেতে পড়ল।

সূরয সিং-এর চেহারা পাল্টে গেছে। তার চাউনিতে ঘৃণার বদলে এখন সম্ভ্রম।

'আমি চল্লিশ গজ দূর থেকে বাঘ মেরেছি, কিন্তু তোমার মতো টিপ আমার

নেই। ঠিক আছে, আমি তোমার নামেই চেক লিখে দিচ্ছি, তুমি মুক্তোটা আমাকে দাও।'

ফেলুদা পকেট থেকে ভেলভেটের কৌটোটা বার করে সূরয সিংকে দিল। কৌটোটা থেকে মুক্তোটা বার করে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন সূরয সিং। তাঁর চোখ জ্বল জ্বল করছে।

'আমি এটাকে যাচাই করে নিলে আশা করি তোমার আপত্তি হবে না। এতগুলো টাকা...'

'ঠিক আছে।'

'শঙ্করপ্রসাদ!' হাঁক দিলেন সূরয সিং। পাশের ঘর থেকে একজন ফিটফাট ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, বছর চল্লিশেক বয়স, চোখে সোনার চশমা।

'স্যার?'

'একবার দেখ ত এই মুক্তোটা জেনুইন কি না।'

শঙ্করপ্রসাদ মিনিটখানেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেই সেটা সূরয সিংকে ফেরত দিল।

'নো স্যার।'

'মানে?'

'এটা ফল্‌স। সস্তা সাদা কালচারড পার্লের উপর গোলাপী রঙ করে দেওয়া হয়েছে।'

'আর ইউ শিওর?'

'অ্যাবসোলিউটলি।'

সূরয সিং-এর মুখ লাল। কাঁপতে কাঁপতে ফেলুদার দিকে চাইলেন। তাঁর কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

'ইউ-ইউ—মেকি জিনিস আমাকে পাচার করছিলে?'

ফেলুদার মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'তা হলে বড়ালের বাড়িতেই নিশ্চয়ই ফল্‌স মুক্তো ছিল,' বলল ফেলুদা।

'তোমার রিভলভার নামাও।'

ফেলুদা নামাল।

'এই নাও তোমার ঝুঠা মোতি।'

ফেলুদা বাক্সসমেত মুক্তোটা সূরয সিং-এর হাত থেকে নিল।

'নাউ গেট আউট।'

আমরা তিনজন সুবোধ বালকের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। যখন লিফ্‌টে উঠছি তখন দেখলাম ফেলুদার কপালে গভীর খাঁজ।

কলকাতা ফেরার পথে ট্রেনে ফেলুদা একটা কথাও বলল না। এমন অবস্থায় যে সে কোনোদিন পড়েনি সেটা আর কেউ না জানুক, আমি ত জানি।

আমরা ফিরলাম রাত্রে। পরদিন সকালে আমার ঘর থেকে শুনতে পেলাম ফেলুদা গুন গুন করে গান গাইছে।

আমি বসবার ঘরে এসে দেখি ও পায়চারি করছে আর 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায়'-এর সুরটা ভাঁজছে। আমাকে দেখেও সে পায়চারি, গান কোনটাই থামল না। আমি অবশ্য খুশি। ফেলুদাকে মনমরা দেখতে আমার মোটেও ভালো লাগে না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই লালমোহনবাবুর গাড়ির হর্ন শোনা গেল। আমি দরজাটা খুলে দিলাম, ভদ্রলোক ঢুকলেন।

'প্রাতঃ প্রণাম!' ঘাড় হেঁট করে হাতজোড় করে বলল ফেলুদা। 'আসতে আজ্ঞা হোক।'

লালমোহনবাবু কেমন যেন থতমত খেয়ে একটা বোকা হাসি হেসে বললেন, 'আপনি কি তা হলে... ?'

'আমি অন্ধকার পছন্দ করি না, লালমোহনবাবু, তাই সেখানে আমাকে বেশিক্ষণ ফেলে রাখা চলে না। ফল্‌স মুক্তোটা যে আপনার গড়পারের সেক্‌রা বন্ধুর কীর্তি সেটা আমি বুঝেছি, আর এটা যে আপনার এবং আমার ভ্রাতার যৌথ প্রয়াস সেটা বুঝেছি, কিন্তু কবে কখন—'

'বলছি, স্যার, বলছি,' বললেন লালমোহনবাবু। 'অপরাধ নেবেন না কাইন্ডলি। আর আপনার ভাইটিকেও মাপ করে দেবেন। আপনি মগনলালের হুমকি যে রকম বেপরোয়া ভাবে নিলেন, তাতে আমি অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছিলুম। ও মুক্তোটা পেয়ে যাবে এই চিন্তাটাই আমি বরদাস্ত করতে পারছিলুম না। ও তিন দিন সময় দিয়েছিল সোম, মঙ্গল, বুধ। মঙ্গলবার আমি সকালে আসি। আপনি চুল ছাঁটাতে গেলেন, মনে আছে ত? সেই সময় তপেশ আপনার চাবি দিয়ে আলমারি খুলে মুক্তোটা বার করে আমায় দেয়। এক দিনেই ডুপ্লিকেট হয়ে যায়। বুধবার ওটা তপেশকে এনে দিই, ও সুযোগ বুঝে সেটা আলমারিতে রেখে দেয়। যা করেছি তা শুধু আপনার মঙ্গলের জন্য, বিশ্বাস করুন।'

'আপনাদের ফন্দি অবিশ্যি তারিফ করার মতোই।'

'আপনি সেদিন যখন মগনলালকে বললেন মুক্তোটা ফলস, তখন আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাদের কারসাজি ধরে ফেলেছেন।'

'না ধরিনি। আপনাদের পক্ষে এতটা মাথা খাটানো সম্ভব সেটা ভাবতে পারিনি। আসলে আপনারা যে ফেলু মিত্তিরের এত কাছে থাকেন সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।'

'জয়চাঁদবাবু নিশ্চয়ই আরো ভাল অফার পাবেন।'

'অলরেডি পেয়েছেন। কাল এসে সোমেশ্বরের একটা চিঠিতে জানলাম। এক আমেরিকান ভদ্রলোক। এক লাখ পঁচিশ অফার করেছেন।'

'বাঃ, এতো সত্যিই সুখবর।'

ফেলুদা এবার আমার দিকে ফিরল। আমি একটা গাঁট্টা কি রদ্দা এক্সপেক্ট করছিলাম, তার বদলে ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'তোকে একটা অ্যাডভাইস দিই। এই ঘটনাটার বিষয় যখন লিখবি, তখন তোদের এই কীর্তিটার কথা একেবারে শেষে প্রকাশ করবি। নইলে গল্প জমবে না।'

আমি অবিশ্যি তাই করেছি। লোকে আশা করি আমার এই কারচুপিটা মাইন্ড করবে না।

'তা হলে এবার আসলটা আপনাকে দিয়ে দিই?' বললেন লালমোহনবাবু।

'ইয়েস, ইফ ইউ প্লীজ, মিস্টার গাঙ্গুলি।'

জটায়ু পকেট থেকে লাল ভেলভেটের কৌটোটা বার করে ফেলুদাকে দিল। ফেলুদা বাক্সটা খুলে জানালার কাছে গিয়ে আলোতে ধরল।

গোলাপী মুক্তা সগৌরবে বিরাজমান।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

দীর্ঘ দিন পরেও এর গুণ জলের মত পরিষ্কার
তাই খারাপ জিনিষ নিয়ে ঝামেলায় পড়বেন কেন?

টি-প্লাস বা তিন গুণ পুরু কোটিং যোগায় তৃপ্তি। এর জন্যই নন্-স্টিক বছরের পর বছর নন্-স্টিকই থাকে। বিদেশ থেকে আমদানী করা নন্-স্টিক সামগ্রী ভারতীয় রান্নার জন্যে বিশেষভাবে গড়ে নেওয়া হয়, এটি তাওয়ার ওপর শুকনো-তাপের ধকল বেশি ভাল সইতে পারে। সস্প্যান আর ফ্রাইপ্যানে এটি মশলা আর বেশী-তেলে ভাজার ধকলও সুন্দর সইতে পারে। যা-ই রাঁধুন না কেন - তৃপ্তির টি-প্লাস নন্-স্টিক থাকে বছরের পর বছর। তাই অন্য কিছু নেবার ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন? যে-নন্-স্টিক অনেক বছর এগিয়ে আছে সেই তৃপ্তি টি-প্লাস সুবিধার ওপরই ভরসা রাখুন।

VENART/GA/BN

রান্নার নন্-স্টিক বাসন তৈরির ব্যাপারে ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা।

বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য লিখুন

* ট্রেড মার্ক

তৃপ্তি আসল নন্-স্টিক রান্নার বাসন

তৃপ্তি সি-৪৩, রোড নং ২২, ওয়াগ্‌লে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, থানা-৪০০ ৬০৪।

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প

সত্যজিৎ রায়

গাঁয়ের লোকে একদিন ঠিক করল নাসীরুদ্দীনকে নিয়ে একটু মশকরা করবে। তারা তার কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে বললে, 'মোল্লাসাহেব, আপনার এত জ্ঞান, একদিন মসজিদে এসে আমাদের তত্ত্বকথা শোনান না।' নাসীরুদ্দীন এক কথায় রাজি।

দিন ঠিক করে ঘড়ি ধরে মসজিদে হাজির হয়ে নাসীরুদ্দীন উপস্থিত সবাইকে সেলাম জানিয়ে বললে, 'ভাই সকল, বল ত দেখি আমি এখন তোমাদের কী বিষয় বলতে যাচ্ছি ?'

সবাই বলে উঠল, 'আজ্ঞে সে ত আমরা জানি না।'

মোল্লা বলল, 'এটাও যদি না জান তাহলে আর আমি কী বলব। যাদের বলব তারা এত অজ্ঞ হলে চলে কি করে ?'

এই বলে নাসীরুদ্দীন রাগে গজগজ করতে করতে মসজিদ ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এল।

গাঁয়ের লোক নাছোড়বান্দা। তারা আবার তার বাড়িতে গিয়ে হাজির।

'আজ্ঞে, আসছে শুক্রবার আপনাকে আর একটিবার আসতেই হবে মসজিদে।'

নাসীরুদ্দীন গেলেন, আর আবার সেই প্রথম দিনের প্রশ্ন দিয়েই শুরু করলেন। এবার সব লোকে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।'

'সবাই জেনে ফেলেছে ? তা হলে ত আর আমার কিছু বলার নেই'—এই বলে নাসীরুদ্দীন আবার বাড়ি ফিরে গেলেন। গাঁয়ের লোক তবুও ছাড়ে না। পরের শুক্রবার নাসীরুদ্দীন আবার মসজিদে হাজির হয়ে তাঁর সেই বাঁধা প্রশ্ন করলেন। এবার আর মোল্লাকে রেহাই দেবে না গাঁয়ের লোক, তাই অর্ধেক বলল 'জানি,' অর্ধেক বলল 'জানি না'।

'বেশ, তাহলে যারা জান তারা বলো, আর যারা জান না তারা শোন'—এই বলে নাসীরুদ্দীন আবার ঘরমুখো হলেন।

নাসীরুদ্দীন লেখাপড়া বেশি জানে না ঠিকই, কিন্তু তার গাঁয়ে এমন অনেক লোক আছে যাদের বিদ্যে তার চেয়েও অনেক কম। তাদেরই একজন নাসীরুদ্দীনকে দিয়ে নিজের ভাইকে একটা চিঠি লেখাল। লেখা শেষ হলে পর সে বলল, 'মোল্লাসাহেব কী লিখলেন একবারটি পড়ে দেন, যদি কিছু বাদটাদ পড়ে গিয়ে থাকে।'

নাসীরুদ্দীন 'প্রিয় ভাই আমার' পর্যন্ত পড়ে ঠেকে গিয়ে বলল, 'পরের কথাটা "বাক্স" না "গরম" না "ছাগল" সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'সেকি মোল্লাসাহেব, আপনার লেখা চিঠি আপনিই পড়তে পারেন না তা অপরে পড়বে কী করে ?'

'সেটা আমি কী জানি ?' বললে নাসীরুদ্দীন। 'আমায় লিখতে বললে আমি লিখলাম। পড়াটাও কি আমার কাজ নাকি ?'

লোকটা কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বলল, 'তা ঠিকই বললেন বটে। তাছাড়া, এ চিঠি ত আর আপনাকে লেখা নয়। কাজেই আপনি পড়তে না পারলে আর ক্ষতি কী ?'

'হক্ কথা,' বললে নাসীরুদ্দীন।

নাসীরুদ্দীন একবার ভারতবর্ষে এসে এক সাধুর দেখা পেয়ে ভাবল, 'আমার মতো জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর সাক্ষাৎ পাওয়া পরম সৌভাগ্য। এঁর সঙ্গে আলাপ না করলেই নয়।'

তাঁকে জিগ্যেস করতে সাধু বললেন তিনি একজন যোগী ; ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে সকলের সেবাই তাঁর ধর্ম।

নাসীরুদ্দীন বলল, 'ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি মৎস্য একবার আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিল।'

একথা শুনে যোগী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, 'আমি এত দীর্ঘকাল প্রাণীর সেবা করেও তাদের এত অন্তরঙ্গ হতে পারিনি। একটি মৎস্য আপনার প্রাণরক্ষা করেছে শুনে এই দেখুন আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না ত কে থাকবে ?'

নাসীরুদ্দীন যোগীর সঙ্গে থেকে তার কাছ থেকে যোগের নানান কসরৎ শিক্ষা করল। শেষে একদিন যোগী বললেন, 'আর ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে যদি সেই মৎস্যের উপাখ্যানটি শোনান।'

'একান্তই শুনবেন ?'

'হে গুরু !' বললেন যোগী, 'শোনার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।'

'তবে শুনুন,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'একবার খাদ্যাভাবে প্রাণ যায় যায় অবস্থায় আমার বঁড়শীতে একটি মাছ ওঠে। আমি সেটা ভেজে খাই।'

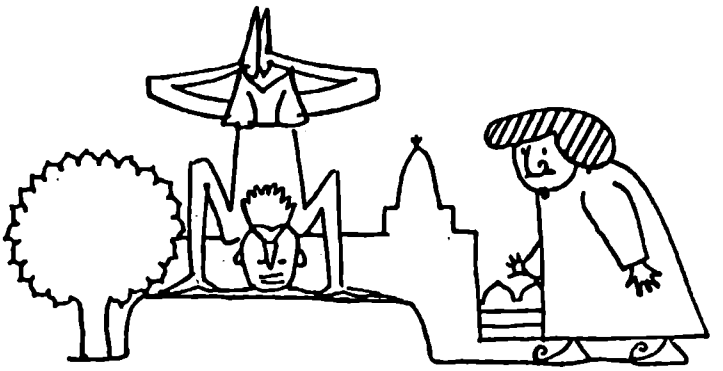

এক ধনী লোকের বাড়িতে ভোজ হবে খবর পেয়ে নাসীরুদ্দীন সেখানে গিয়ে হাজির।

ঘরের মাঝখানে বিশাল টেবিলের উপর লোভনীয় সব খাবার সাজানো রয়েছে রুপোর পাত্রে। টেবিল ঘিরে কুরসি পাতা, তাতে বসেছেন হোমরা-চোমরা সব খাইয়েরা। নাসীরুদ্দীন সেদিকে এগোতেই কর্মকর্তা তার মামুলি পোশাক দেখে তাকে ঘরের এক কোণায় ঠেলে দিলেন। নাসীরুদ্দীন বুঝল সেখানে খাবার পৌঁছতে হয়ে যাবে রাত কাবার। সে আর সময় নষ্ট না করে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে তোরঙ্গ থেকে তার ঠাকুরদাদার আমলের একটা ঝলমলে আলখাল্লা আর একটা মণিমুক্তো বসানো আলিশান পাগড়ি বার করে সেগুলো পরে আবার নেমন্তন্ন বাড়িতে ফিরে গেল।

এবার কর্মকর্তা তাকে একেবারে খাস টেবিলে বসিয়ে দিলেন, আর বসামাত্র নাসীরুদ্দীনের সামনে এসে হাজির হল ভুরভুরে খুশবুওয়ালা পোলাওয়ের পাত্র। নাসীরুদ্দীন প্রথমেই পাত্র থেকে খানিকটা পোলাও তুলে নিয়ে তার আলখাল্লায় আর পাগড়িতে মাখিয়ে দিল। পাশে বসেছিলেন এক আমীর। তিনি ভারী অবাক হয়ে বললেন, 'জনাব, আপনি খাদ্যদ্রব্য যেভাবে ব্যবহার করছেন তা দেখে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অর্থ জানতে পারলে আমি বিশেষ বাধিত হব।'

'অর্থ খুবই সোজা,' বললে নাসীরুদ্দীন। 'এই আলখাল্লা আর এই পাগড়ির দৌলতেই আমার সামনে এই ভোজের পাত্র। এদের ভাগ না দিয়ে আমি একা খাব, সে কি হয়?'

'কী হল মোল্লাসাহেব, লুকিয়ে কেন?'

'লজ্জায়,' বললে নাসীরুদ্দীন। 'আমার বাড়িতে তোমাদের নেবার মতো কিছুই নেই, তাই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না ভাই।'

এক চাষা নাসীরুদ্দীনের কাছে এসে বলল, 'বাড়িতে চিঠি দিতে হবে মোল্লাসাহেব। মেহেরবানি করে আপনি যদি লিখে দেন।'

নাসীরুদ্দীন মাথা নাড়লে। 'সে হবে না।'

'কেন মোল্লাসাহেব?'

'আমার পায়ে জখম।'

'তাতে কী হল মোল্লাসাহেব?' চাষা অবাক হয়ে বলল। 'পায়ের সঙ্গে চিঠির কী?'

নাসীরুদ্দীন বললে, 'আমার হাতের লেখা কেউ পড়তে পারে না। তাই চিঠির সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সে চিঠি পড়ে দিতে। জখম পায়ে সেটা হবে কি করে শুনি?'

একদিন বাড়িতে দুজন লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে নাসীরুদ্দীন ভয়ে একটা আলমারিতে ঢুকে লুকিয়ে রইল।

লোক দুটো ছিল চোর। তারা বাক্সপ্যাঁটরা সবই খুলছে, সেই সঙ্গে আলমারিটাও খুলে দেখে তাতে মোল্লাসাহেব ঘাপটি মেরে আছেন।

নাসীরুদ্দীন এক বাড়িতে চাকরের কাজ করছে। মনিব তাকে একদিন ডেকে বললেন, 'তুমি অযথা সময় নষ্ট কর কেন হে বাপু? তিনটে ডিম আনতে কেউ তিনবার বাজার যায়? এবার থেকে একেবারে সব কাজ সেরে আসবে।'

একদিন মনিবের অসুখ করেছে, তিনি নাসীরুদ্দীনকে ডেকে বললেন, 'হাকিম ডাক।'

নাসীরুদ্দীন গেল, কিন্তু ফিরল অনেক দেরিতে, আর সঙ্গে একগুষ্টি লোক নিয়ে।

মনিব বললেন, 'হাকিম কই।'

'তিনি আছেন, আর সঙ্গে আরো আছেন,' বললে নাসীরুদ্দীন।

'আরো কেন?'

'আজ্ঞে হাকিম যদি বলেন পুলটিশ দিতে, তার জন্য লোক চাই। জল গরম করতে কয়লা লাগবে, কয়লাওয়ালা চাই। আপনার শ্বাস উঠলে পর কোরান পড়ার লোক চাই, আর আপনি মরলে পরে লাশ বইবার লোক চাই।'

ছবি : সত্যজিৎ রায়

প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার

মানরো দ্বীপের রহস্য

সত্যজিৎ রায়

মানরো দ্বীপ, ১২ই মার্চ

এই দ্বীপে পৌঁছানর আগে গত তিন সপ্তাহের ঘটনা সবই আমার ডায়রিতে বিক্ষিপ্তভাবে লেখা আছে। হাতে যখন সময় পেয়েছি তখন সেগুলোকেই একটু গুছিয়ে লিখে রাখছি।

আমি যে আবার এক অভিযানের দলে ভিড়ে পড়েছি, সেটা বোধহয় আর বলার দরকার নেই। এই দ্বীপের নাম হয়ত একটা থাকতে পারে, কারণ আজ থেকে তিনশ বছর আগে এখানে মানুষের পা পড়েছিল, কিন্তু সে-নাম সভ্য জগতে পৌঁছায়নি। আমরা এটাকে আপাতত মানরো দ্বীপ বলেই বলছি।

আমরা দলে আছি সবশুদ্ধ পাঁচজন। তার মধ্যে একজন হল আমার পুরনো বন্ধু জেরেমি সন্ডার্স—যার উদ্যোগেই এই অভিযান। এই উদ্যোগের গোড়ার কথা বলতে গেলে বিল ক্যালেনবাখের পরিচয় দিতে হয়। ইনিও আমাদের দলেরই একজন। ক্যালিফর্নিয়ার অধিবাসী, দীর্ঘকায়, বেপরোয়া, শক্তিমান পুরুষ, পেশা ছবি তোলা। বয়স পঁয়তাল্লিশ হতে চলল, কিন্তু চালচলন তার অর্ধেক বয়সের যুবার মতো। ক্যালেনবাখের সঙ্গে সন্ডার্সের পরিচয় বেশ কয়েক বছরের। গত ডিসেম্বরে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার তরফ থেকে ক্যালেনবাখ গিয়েছিল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি শহরে কিছু স্থানীয় উৎসবের ছবি তুলতে। মোরক্কোর আগাদির শহরে এসে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। আগাদির সমুদ্রতীরের শহর, সেখানে অনেক জেলের বাস। ক্যালেনবাখ জেলেপাড়ায় গিয়েছিল সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে তাদের ছবি তুলতে। একটি জেলের বাড়িতে ঢুকে তার চোখ পড়ে মালিকের বছর তিনেকের একটি ছেলের উপর। ছেলেটি হাতে একটা ছিপিআঁটা বোতল নিয়ে খেলা করছে। বোতলের ভিতরে কাগজ দেখতে পেয়ে ক্যালেনবাখের কৌতূহল হয়। সে ছেলেটির হাত থেকে বোতল নিয়ে দেখে তার ছিপি সীল করে বন্ধ করা এবং ভিতরের কাগজটা হল ইংরাজিতে লেখা একটা চিঠি। হাতের লেখার ধাঁচ থেকে মনে হয় সে-চিঠি

বহুকালের পুরনো। ছেলেটির বাপকে জিগ্যেস করে ক্যালেখবাখ জানে যে ওই বোতল নাকি তার ঠাকুরদার আমল থেকে তাদের বাড়িতে আছে। জেলেরা জাতে মুসলমান আরবী ভাষায় কথা বলে, তাই বোতল থেকে চিঠি বার করে পড়ার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।

সেই চিঠি ক্যালেনবাখ বোতল থেকে বার করে পড়ে এবং পড়ার অল্পদিনের মধ্যেই তার কাজ সেরে সোজা চলে যায় লন্ডনে। সেখানে সন্ডার্সের সঙ্গে দেখা করে চিঠিটা তাকে দেখায়। পেনসিলে লেখা মাত্র কয়েক লাইনের চিঠি। সেটার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—

ল্যাটিচিউড ৩৩° ইস্ট—লঙ্গিচিউড ৩৩° নর্থ, ১৩ই ডিসেম্বর ১৬২২

এই অজানা দ্বীপে আমরা এমন এক আশ্চর্য উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছি যার অমৃততুল্য গুণ মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই সংবাদ প্রচারের জন্য ব্র্যান্ডনের নিষেধ সত্ত্বেও এ-চিঠি আমি বোতলে ভরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি। ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন এখন এই দ্বীপের অধীশ্বর। অতএব এই চিঠি পড়ে কোনো দল যদি এই উদ্ভিদ্ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এখানে আসে, তারা যেন ব্র্যান্ডনের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে। আমি নিজে ব্র্যান্ডনের হাতের শিকার হতে চলেছি।

হেকটর মানরো

সন্ডার্স চিঠিটা পেয়ে প্রথমেই যে-কাজটা করে,সেটা হল লন্ডনের নৌবিভাগের আপিসে গিয়ে ১৬২১-২২ সালে আটলান্টিক মহাসাগরে কোনো জাহাজডুবি হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা। সমুদ্রযাত্রা সংক্রান্ত অতি প্রাচীন দলিলও রাখা থাকে নৌবিভাগে। ১৬২২ সালের তিনটি জাহাজডুবির মধ্যে একটির যাত্রী-তালিকায় ডাঃ হেকটর মানরোর নাম পাওয়া যায়। এই জাহাজটি—নাম 'কংকুয়েস্ট'—জিব্রলটার থেকে যাচ্ছিল আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে। বারমুডার কাছাকাছি এসে জাহাজডুবি হয়। কারণ জানা যায়নি। নৌবিভাগের রিপোর্টে বলছে কেউ বাঁচেনি ; কিন্তু হেকটর মানরো যে বেঁচেছিল তার প্রমাণ এখন পাওয়া যাচ্ছে। তবে মানরোর চিঠিতে যে ব্র্যান্ডন ব্যক্তিটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, এই নামে কোনো যাত্রী কংকুয়েস্ট জাহাজে ছিল না। সন্ডার্স অনুসন্ধান করে জানে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রেগ ব্র্যান্ডন নামে এক দুর্ধর্ষ জলদস্যু ছিল। ব্র্যান্ডনের নাকি একটা চোখ ছিল না ; তার জায়গায় ছিল একটি গহ্বর। সেই কারণে তার নাম হয়ে গিয়েছিল ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন। সোনার লোভে এই ব্র্যান্ডন নাকি এক হাজারেরও বেশি মানুষ খুন করেছিল। জামাইকা দ্বীপ সেই সময়ে ছিল ইংরাজ জলদস্যুদের একটা প্রধান আস্তানা। এমন হতে পারে যে, কংকুয়েস্ট জাহাজ ব্র্যান্ডনের দস্যু-জাহাজের কবলে পড়ে এবং তার ফলেই ধ্বংস হয়। মানরো যে বেঁচেছে তার একটা কারণ হয়ত এই যে, ব্র্যান্ডনই তাকে বাঁচিয়েছে। এটা ভুললে চলবে না যে মানরো ছিল ডাক্তার। দস্যু জাহাজে তখনকার দিনে একজন ভালো ডাক্তারের কদর ছিল খুব বেশি। সেকালে সমুদ্রযাত্রায় স্কার্ভি, পেল্যাগ্রা, বেরি-বেরি ইত্যাদি ব্যারাম জাহাজে একবার দেখা দিলে নাবিকদের বাঁচবার আশা প্রায় থাকত না বললেই চলে। তাই একজন ভালো ডাক্তার—যিনি এইসব ব্যারামের চিকিৎসা করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার করতে পারবেন—সে যুগে ছিল সমুদ্রযাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। হেক্টর মানরো নিশ্চয়ই এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে মানরো আর ব্র্যান্ডন শেষকালে এই অজানা দ্বীপে কী ভাবে হাজির হয় তার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

মোটকথা, এই সব তথ্য জেনে সন্ডার্সের রোখ চাপে সাড়ে তিন শ' বছর পেরিয়ে গেলেও সে একবার এই অজানা দ্বীপে পাড়ি দেবে। আমাকে এ ব্যাপারে লেখামাত্র আমি অভিযানে যোগ দিতে রাজি হয়ে সাতদিনের মধ্যে লন্ডনে চলে আসি। এসে দেখি, যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ক্যালেনবাখ অবিশ্যি প্রথমেই জানিয়ে রেখেছিল যে, অভিযান হলে সে তাতে যোগ দেবে। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম সে টেলিভিশনের জন্য ছবি তুলে অনেক পয়সা রোজগারের স্বপ্ন দেখছে।

দলের চতুর্থ ব্যক্তি হলেন একজন জাপানী বৈজ্ঞানিক। এঁর নাম হিদেচি সুমা। এনার অনেক গুণের একটির পরিচয় আমার সামনেই সমুদ্রতটে বিরাজমান। এটি একটি জেটচালিত সমুদ্রযান। নাম সুমাক্রাফ্‌ট। এ যে কী আশ্চর্য জিনিস তা আমরা এই দেড়হাজার মাইল সমুদ্রপথে এসেই বুঝেছি। নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও এই সুমাক্রাফ্‌ট আমাদের একটিবারের জন্যও অসুবিধায় ফেলেনি। এই নৌকার ডিমনস্ট্রেশন দিতেই সুমা লন্ডনে এসেছিলেন, আর তখনই সন্ডার্সের সঙ্গে আলাপ হয়। সুমা শুধু এই জেটবোটের জনক নন। তাঁর তৈয়ারি আরো অনেক ছোটখাটো যন্ত্রপাতি তিনি সঙ্গে এনেছেন, যা তাঁর মতে আমাদের অভিযানে সাহায্য করবে। তাছাড়া সুমা একজন প্রথম শ্রেণীর জীবরাসায়নিক। সব শেষে আরো একটি বিশেষ গুণের কথা না বললে সুমার পরিচয় সম্পূর্ণ হবে না: এনার মতো পরিপাটি ফিটফাট মানুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। এঁকে যে-কোনো সময় দেখলেই মনে হবে ইনি বুঝি তাঁর নিজের শহর ওসাকাতেই রয়েছেন, এবং এই মুহূর্তে ব্রীফকেসটি হাতে করে আপিসে রওনা দেবেন।

পঞ্চম ব্যক্তিটির নাম বলার আগে তিনি কীভাবে দলভুক্ত হলেন সেটা বলি।

সন্ডার্স এই অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েই লন্ডনের সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দলে যোগ দেবার জন্য লোক আহ্বান করে। যোগ্যতা হিসেবে পাঁচটি শর্ত দেওয়া হয়েছিল।—এক, সমুদ্রযাত্রার পূর্ব অভিজ্ঞতা ; দুই, অন্তত দুটি বৈজ্ঞানিক অভিযানে অংশ গ্রহণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ; তিন, বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় একটি উচ্চমানের ডিগ্রী ; চার, সুস্বাস্থ্য ; পাঁচ, অস্ত্রচালনার অভিজ্ঞতা। আমাদের এই পাঁচ নম্বর ব্যক্তিটি শুধু প্রথম শর্তটি ছাড়া আর কোনটিই পালন করতে পারেননি। ইনি বিজ্ঞানী নন। ইনি সাহিত্যিক ; ইনি বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক কোনো অভিযানেই কখনো অংশগ্রহণ করেননি ; কেবল ইস্কুলে থাকতে একবার দলে পড়ে স্কটল্যান্ডের বেন নেভিস পাহাড়ের

গা বেয়ে দেড় হাজার ফুট উঠেছিলেন। বেন নেভিসের উচ্চতা যেখানে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট, সেখানে এটাকে খুব বড় রকম কৃতিত্ব বলা চলে না। তবে এঁকে দলভুক্ত করার কারণ কী ?

কারণ এই যে ডেভিড মানরো হল হেকটর মানরোর বংশধর। আমরা যে কথাটা প্রায়ই ব্যবহার করি, সেই চোদ্দ পুরুষ পিছিয়ে গেলেই দেখা যাবে, হেক্টর মানরোর সঙ্গে ডেভিড মানরোর সরাসরি সম্পর্ক। এই ডেভিড সন্ডার্সের বিজ্ঞাপন দেখে সোজা তার বাড়িতে এসে তাকে অনুরোধ করে এই অভিযানে তাকে সঙ্গে নেবার জন্য। সে বলে যে বাপঠাকুর্দার কাছে সে শুনেছে শেকস্‌পিয়রের সমসাময়িক ডাঃ মানরোর কথা। ব্রিটিশ নৌবাহিনী যখন স্প্যানিশ আরমাডাকে জলযুদ্ধে পরাজিত করে, তখন ব্রিটিশদের সেনাপতি ডিউক অফ এফিংহ্যামের নিজের জাহাজে ডাক্তার ছিলেন হেক্টর মানরো। তাছাড়া ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত জেনে ডেভিডের আরো রোখ চেপে যায়। সে ছেলেবেলা থেকে জলদস্যুদের কাহিনী পড়ে এসেছে ; এমন কী, ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডনকে ঘিরেও অনেক গল্প তার জানা। এই দ্বীপে যদি ব্র্যান্ডনের কোনো সিন্দুক থেকে থাকে, এবং তাতে যদি ধনরত্ন পাওয়া যায়, তাহলে ডেভিডের পক্ষে সেটা হবে এক অবিস্মরণীয় অ্যাডভেঞ্চার। এখানে বলা দরকার যে, ডেভিডের বয়স মাত্র বাইশ।

তরুণ ডেভিড মানরোকে দেখে তার স্বাস্থ্য এবং শ্রমক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে বাধ্য। তার হাত দেখলেই বোঝা যায়, সে-হাত কলম ছাড়া আর কোনো হাতিয়ার ধরেনি। তার চোখের উদাস দৃষ্টি, তার মৃদুস্বরে কথা বলার ঢং, তার কাঁধ অবধি নেমে আসা অবিন্যস্ত সোনালি চুল, সবই প্রমাণ করে যে, তার কল্পনার জোর যতই হোক না কেন, তার শারীরিক বল সামান্যই। কিন্তু এই ডেভিডকেই সন্ডার্স শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে, কারণ তার একটা গুণকে সে অগ্রাহ্য করতে

পারেনি—ওই বোতলের চিঠি যার লেখা তার রক্ত বইছে ডেভিড মানরোর ধমনীতে।

এ ছাড়াও আরেকজন আছেন দলে, তিনি হলেন একটি শ্বাপদ ; ডেভিডের পোষা গ্রেট ডেন কুকুর রকেট। আমাদের সকলের মধ্যে এঁরই স্বাস্থ্য যে সবচেয়ে ভালো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা আজই সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি। দিনে তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করেও গত দুদিনে ডাঙার কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে সন্দেহ হচ্ছিল, আটলান্টিক মহাসাগরের এ অংশে আদৌ কোনো দ্বীপ আছে কিনা। আজ ভোরে যখন দূরবীনে চোখ লাগিয়ে সন্ডার্স বলল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ডাঙা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ক্যালেনবাখ তৎক্ষণাৎ মুভী ক্যামেরা নিয়ে তৈরি। আমার অবাক লাগছিল এই কারণে যে, সচরাচর ডাঙা আসার অনেক আগেই সীগালের দল উড়ে এসে কর্কশ গলায় জানিয়ে দিয়ে যায় আসন্ন ভূখন্ডের কথা। এবারে দেখলাম তার ব্যতিক্রম।

এখানে এসে বুঝছি এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আজ সারাদিন প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ঘুরেও কয়েকটি পোকা এবং সমুদ্রতটে কিছু কাঁকড়া ছাড়া আর কোনো প্রাণীর সাক্ষাৎ পাইনি। শুধু তাই নয় ; নতুন ধরনের কোনো উদ্ভিদও চোখে পড়েনি। এসব অঞ্চলে যেমন গাছপালা ফলমূল আশা করা যায়, তার বাইরে কিছুই দেখিনি। অবিশ্যি আজ আমরা দ্বীপের কেবলমাত্র পশ্চিম অংশের খানিকটা ঘুরে দেখেছি।

আমরা ক্যাম্প ফেলেছি সমুদ্রতটের কাছেই। এটা দ্বীপের দক্ষিণ অংশ। এদিকটায় গাছপালা বিশেষ নেই ; কেবল বালি আর পাথর। দ্বীপটা আয়তনে ছোট, এবং মোটামুটি সমতল ; কিন্তু মাঝখানের অংশটা—যেটা আমাদের ক্যাম্প থেকে পাঁচ-সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে—খানিকটা উঁচু আর বেশ বড় বড় টিলায় ভর্তি।

ডেভিড বেশ ফুর্তিতে আছে ; সমুদ্রতটে রকেটের সঙ্গে তার ছুটোছুটি দেখতেও ভালো লাগছে। লন্ডনে বা সমুদ্রযাত্রায় তার যা চেহারা দেখেছি, এখানে এসে এই কয়েক ঘন্টাতেই যে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

গোলমাল করছে এক ক্যালেনবাখ। দ্বীপে পদার্পণমাত্র সে একনাগাড়ে ত্রিশটা হাঁচি দিল, আর তার পরেই এল কম্প দিয়ে জ্বর। বলা বাহুল্য আজ ওকে সঙ্গে নিতে পারিনি। সুমা আর ও ক্যাম্পেই ছিল। সুমা তার যন্ত্রপাতিগুলোকে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখছে আর সেই সঙ্গে একটি খুদে ল্যাবরেটরিও খাড়া করছে। নতুন কোনো উদ্ভিদ যদি পাওয়া যায় তাহলে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে।

জ্বর সত্ত্বেও ক্যালেনবাখ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে যে, আমরা দু-তিন দিনের মধ্যেই এখান থেকে পাততাড়ি গোটাব। তার মতে এমন দ্বীপ নাকি সারা আটলান্টিক মহাসাগরে ছড়ানো।

আমি কিন্তু হেকটর মানরোর চিঠির কথা ভুলতে পারছি না। ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড যখন মিলেছে তখন এই দ্বীপই সেই চিঠির দ্বীপ। এই দ্বীপেই মানরো সেই আশ্চর্য উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছিল।

১৩ই মার্চ, দুপুর বারোটা

ক্যালেনবাখের ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলল না। দু-একদিনের মধ্যে এ দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ব্যাপারটা খুলে বলি।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সমুদ্রে স্নান আর ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরোনর আয়োজন করছি, এমন সময় ডেভিড হঠাৎ এসে বলল সে রকেটকে নিয়ে একটু একা ঘুরে আসতে চায়। তার সাহস যে বেড়েছে, সেটা কালকেই বুঝেছিলাম। আসলে সাহিত্যিক মানুষ তো, তার পক্ষে আমাদের মতো বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান বেশ কষ্টকর। আমরা এসেছি সব কিছু ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার জন্য, আর সেটার জন্য চাই সময় আর ধৈর্য। ডেভিড বলল, সে ওই দূরের টিলাগুলোর দিকে গিয়ে দেখতে চায় ওগুলোতে কোনো গুহা-টুহা আছে কিনা। তার ধারণা তার মধ্যে হয়ত ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডনের গুপ্তধন থাকতে পারে। "আমি যাব আর আধ ঘণ্টায় দেখে ঘুরে আসব," বলল ডেভিড।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, এইসব দ্বীপে বড় জানোয়ার না থাকলেও বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। কাজেই তার পক্ষে এ ঝুঁকি নেওয়ার কোনো মানে হয় না। ডেভিড তবুও মানতে চায় না ; বলে, ক্যালেনবাখের পিস্তল আছে, সেটা সে সঙ্গে নিয়ে নেবে ; তা ছাড়া রকেট আছে, সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই।

এই নির্বোধ বালকের ছেলেমানুষী গোঁ কীভাবে নিরস্ত করা যায় ভাবছি, এমন সময় শুনি—"নো—নো নো নো নো।"

সুমা বেরিয়ে এসেছে তার ক্যাম্প থেকে মাথা নাড়তে-নাড়তে।

"নো—নো নো নো নো।"

কী ব্যাপার ? হাসি হাসি মুখের সঙ্গে এমন দৃঢ় নিষেধাজ্ঞা বেশ মজার লাগছিল। সুমা হাত থেকে একটা ছোট যন্ত্রজাতীয় জিনিস বালির ওপর নামিয়ে রেখে বলল, "দেয়ার ইজ সামথিং বিগ হিয়ার। সাম লিভিং থিং। ফাইভ পয়েন্ট সেভেন কিলোমিটার ফ্রম হিয়ার— ওই দিকে।"

সুমা হাত দিয়ে দূরে টিলাগুলোর দিকে দেখিয়ে দিল। তারপর তার তৈরি আশ্চর্য যন্ত্রটা দেখাল। নাম দিয়েছে টেলিকার্ডিওস্কোপ। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহুদূরের প্রাণীর হৃৎস্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। এর দৌড় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত। প্রাণী ঠিক কোনদিকে কতদূরে আছে সেটা যন্ত্রের রিসিভারের মুখ আর সেই সঙ্গে একটি নব্ ঘুরিয়ে বোঝা যায়। দিক এবং দূরত্ব মিলে যাওয়ামাত্র যন্ত্রের মধ্যে শুরু হয় হৃৎস্পন্দনের শব্দ, আর তার সঙ্গে তাল রেখে জ্বলতে নিভতে থাকে একটা রঙীন বাতি। দশ কিলোমিটারে বাতির রঙ হয় গাঢ় বেগুনী। প্রাণী কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে রং রামধনুর নিয়ম মেনে নীল সবুজ হলদে কমলা ইত্যাদি অতিক্রম করে, যখন প্রাণী এক কিলোমিটার দূরত্বে এসে পড়ে তখন লাল হয়ে জ্বলতে থাকে। সেই সঙ্গে অবিশ্যি হৃৎস্পন্দনের শব্দও বেড়ে যায়। প্রাণী এক কিলোমিটারের বেশি কাছে এসে পড়লে আর

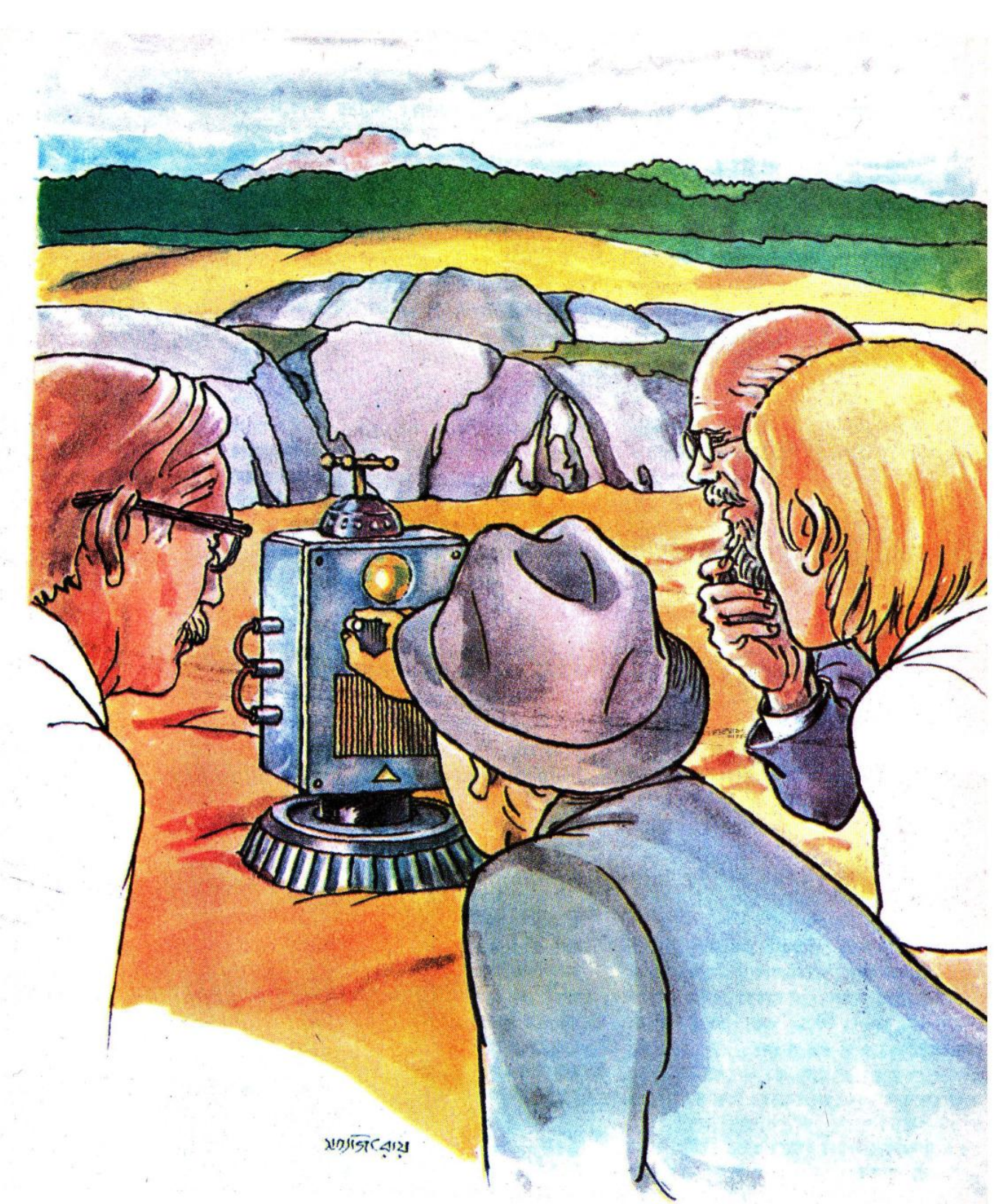

এ যন্ত্রে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

"একই জায়গায় রয়েছে প্রাণীটা," বলল সুমা। "অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট ইজ কোয়াইট বিগ।"

"বিগ মানে ? কত বড় ?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"মানুষের চেয়ে বড় বলেই মনে হয়। প্রাণীর আয়তন যত বড় হয় তার হৃৎস্পন্দন তত ঢিমে হয়। একজন সাধারণ মানুষের হার্টবীট মিনিটে সত্তরের মতো। এর দেখছি পঞ্চাশের একটু ওপরে।"

"কচ্ছপ হতে পারে কি ?" আমি জিগ্যেস করলাম। এসব অঞ্চলে কচ্ছপ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর অন্য যা বড় জানোয়ার থাকতে পারে, যেমন হরিণ বা বাঁদর, তার হৃৎস্পন্দনের রেট মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত।

"যে ভাবে এক জায়গায় চুপ করে পড়ে আছে, তাতে কচ্ছপ হতে পারে," বলল সুমা। "কিন্তু সমুদ্র থেকে এত দূরে দ্বীপের মাঝখানে গিয়ে সে-কচ্ছপ কী করছে সেটা একটা প্রশ্ন বটে।"

সন্ডার্স অবিশ্যি কচ্ছপের কথাটা উড়িয়েই দিল। তার

বিশ্বাস এটা অন্য কোনো প্রাণী, এবং হয়ত দ্বীপের একমাত্র বড় প্রাণী। সুতরাং এ অবস্থায় ডেভিডকে কখনই একা বেরোতে দেওয়া চলে না।

আমরা আরো মিনিটখানেক এই শব্দ আর আলোর খেলা দেখার পর সুমা সুইচ টিপে যন্ত্রটা বন্ধ করে দিল। আমি সুমার কৃতিত্বের তারিফ না করে পারলাম না। গ্রেট ডেনের মতো কুকুর মানুষের অনেক আগেই বুঝতে পারে কাছাকাছির মধ্যে অন্য কোনো প্রাণী আছে কিনা ; কিন্তু এই যন্ত্রের কাছে রকেটও শিশু।

আমরা সকলেই বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি, সমস্যা কেবল বিল ক্যালেনবাখকে নিয়ে। তার নিজের সঙ্গে আনা নানারকম ওষুধ খেয়েও কোনো ফল হয়নি। ফিরে এসে ওকে একটা মিরাকিউরলের বড়ি খাইয়ে দেব। আমার তৈরি এই ওষুধে এক সর্দি ছাড়া সব অসুখই একদিনের মধ্যে সেরে যায়। এখন বেচারা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। কারণ দ্বীপে প্রাণী আছে জেনে ওর মনে আশার সঞ্চার হয়েছে হয়ত টেলিভিশন ক্যামেরাটা একেবারে মাঠে মারা যাবে না। সুমা আজও ক্যাম্পেই থাকবে। আর ঘণ্টাখানেক কাজ করলেই নাকি ওর খুদে ল্যাবরেটরিটা তৈরি হয়ে যাবে।

আমরা তিনজন রকেটকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাছাকাছির মধ্যে কোনো জানোয়ার এসে পড়লে রকেটই জানান দিয়ে দেবে, আর জানোয়ার যতক্ষণ না কাছে আসছে ততক্ষণ ভয়ের কোনো কারণ নেই।

আমাদের লক্ষ্য কিন্তু দ্বীপের মাঝখানের ওই টিলাগুলো নয়। ও অঞ্চলে গাছপালা বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। আজ আমরা দ্বীপের পুব দিকটা ঘুরে দেখব। সমুদ্রের উপকূল ধরে এগিয়ে গিয়ে গাছপালা বাড়তে শুরু করলেই উপকূল ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকব। আমাদের তিনজনের সঙ্গেই অস্ত্র রয়েছে। সন্ডার্সের কাঁধে তার জার্মান মানলিখার রাইফল, ডেভিডের পকেটে ক্যালেনবাখের বেরেটা অটোম্যাটিক, আর আমার ভেস্টপকেটে অ্যানাইহিলিন বা নিশ্চিহ্নাস্ত্র। ক্যালেনবাখকে আমার এই যন্ত্রের কথা বলতে সে শাসিয়ে রেখেছে যে, ও সঙ্গে থাকলে যে কোনো জানোয়ারই আসুক না কেন, আমার অস্ত্রটি ব্যবহার করা চলবে না, কারণ যে-জিনিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার ছবি তোলা যাবে না।

হাঁটতে হাঁটতে ঠিক হল যে, কেউ যদি দল ছেড়ে একটু এদিক-ওদিক যেতে চায়, তাহলে তাকে ঘন-ঘন ডাক ছেড়ে সে কত দূরে আর কোনদিকে আছে সেটা জানিয়ে দিতে হবে। দল ছেড়ে বেশিদূর যাওয়া অবশ্যই চলবে না। নিয়মটা অবিশ্যি ডেভিডের জন্যই, কারণ বেশ বুঝতে পারছি যে তার স্বাভাবিক উদাস, অলস ভাবটা কেটে গিয়ে তার জায়গায় একটা ছটফটে ভাব দেখা দিয়েছে। এখন যেরকম জায়গা দিয়ে চলেছি তাতে কিছুটা দূরে সরে গেলেও চোখের আড়াল হবার উপায় নেই। কারণ বড় টিলা বা বড় গাছ জাতীয় কিছুই নেই কাছাকাছির মধ্যে।

একটা কথা মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে— সুমার যন্ত্র কেবল একটিমাত্র প্রাণীর কথা বলল : আরো প্রাণী আছে কি ? যদি থাকে তারা কি সব দশ কিলোমিটারের বেশি দূরে রয়েছে ? বোধহয় না, কারণ আমার বিশ্বাস দ্বীপের আয়তন দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে দশ কিলোমিটারও নয়। দিন সাতেক ঘুরলেই এখানে যা কিছু দেখার সবই দেখা হয়ে যাবে।

উপকূল ধরে মাইলখানেক হাঁটার পর দৃশ্য পরিবর্তন হল। এবার সমুদ্রের ধার ছেড়ে দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকতে হবে। এখানে আমাদের বাঁয়ে— অর্থাৎ সমুদ্রের উলটো দিকে— প্রথমে বেঁটে পামগাছের জঙ্গল ; তারপর ক্রমে সে জঙ্গল আরো ঘন হয়ে গিয়েছে। সেখানে কলা, পেঁপে, নারকোল ইত্যাদি গাছের পাশাপাশি আরো বড় গাছও রয়েছে। এদিকটায় পাথর আর নেই, আর পায়ের নীচে বালির বদলে রয়েছে ঘাস আর আগাছা।

রকেট সমেত আমরা তিনজনে ঢুকলাম জঙ্গলের ভিতর। যেটা সত্যিই অবাক করে দিচ্ছে সেটা হল পাখির ডাকের অভাব। এমন নিস্তব্ধ বন— বিশেষ করে পৃথিবীর এই অংশে, যেখানে কাকাতুয়াই পাওয়া যায় অন্তত আট-দশ রকমের— আমি আর দেখিনি। তাছাড়া এসব জঙ্গলে ঘাসের মধ্যে দিয়ে সরীসৃপের চলাফেরারও একটা শব্দ প্রায়ই পাওয়া যায়, সেটা এখানে নেই। এ যেন এক অভিশপ্ত বন। গাছগুলো যে বেঁচে আছে, তাও হয়ত আর বেশিদিন থাকবে না।

আরো মিনিট দশেক হাঁটার পর জঙ্গলটা একটু পাতলা হল, আর তার কিছু পরেই একটা খোলা জায়গায় এসে আমাদের চারজনকেই থমকে থেমে যেতে হল। ডেভিড এগিয়ে ছিল, সেই প্রথমে একটা ভয় ও বিস্ময় মেশানো শব্দ করে থেমে গেল। আমরা এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তা এই—

জঙ্গলের মাঝখানে খোলা অংশটায় বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে জানোয়ারের হাড়, খুলি আর পাঁজরার অংশ। তার মধ্যে বেশ কষ্ট করে চিনতে পারা গেল দুটো হরিণ, গোটা চারেক গিরগিটি জাতীয় বড় সরীসৃপ—সম্ভবত ইগুয়ানা—আর বেশ কয়েক রকমের বাঁদর। হাড়গুলো যে বহুকালের পুরনো সেটা তাদের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়।

তার মানে এ দ্বীপে এককালে জানোয়ার ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। এরা লোপ পেল কী করে সেটা জানার মতো তথ্য এখনো আমাদের হাতে নেই।

ডেভিড কিছুক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকার পর তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল।

"দ্যাট মনস্টার ! —ওই রাক্ষসই, খেয়ে ফেলেছে এই সব জন্তু জানোয়ার।"

বুঝতে পারলাম, সুমার যন্ত্রে এই কিছুক্ষণ আগেই যে প্রাণীর হার্টবীট শোনা গেছে, ডেভিডের কল্পনায় এরই মধ্যে সেটা হয়ে গেছে রাক্ষস ! অবিশ্যি এগুলো যে কেউ খেয়েছে সেটা ভাববার সময় এখনো আসেনি ; স্বাভাবিক মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর জানোয়ার সব এক জায়গায় এসে মরবে কেন ?

আমরা এগিয়ে চললাম।

সামনে একটা মেহগনি গাছের বন, তার মধ্যে কিছু সীডার গাছও রয়েছে, আর আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে জুঁই আর জবা

জাতীয় ফুল গাছ, আর বুগেনভিলিয়া গাছ। মেহগনি গাছ আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু এখানে এক একটার গুঁড়িতে একটা উজ্জ্বল নীলের ছোপ দেখছি যেটা আগে কখনো দেখিনি।

আরো কাছে যেতে বুঝলাম রঙের কারণ। রঙটা গাছের নয়, গাছের গায়ে মৌমাছির চাকের মতো লেগে থাকা অজস্র ছোট ছোট ফলের মতো জিনিসের। আর সেই সঙ্গে গন্ধের কথাটাও বলা দরকার। এক অনির্বচনীয় সৌরভ ছেয়ে আছে বনের এই অংশটায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য এই উদ্ভিদের আশ্চর্য রঙ ও গন্ধ আমাদের তিনজনকেই অনড় অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে দিল। মোহ কাটলে পর ছেলেমানুষ ডেভিড উল্লাসে দৌড়ে গিয়ে ফলে হাত দিতে যাচ্ছিল, আমি আর সন্ডার্স তাকে ধমক দিয়ে নিরস্ত করলাম। তারপর সন্ডার্স রবারের দস্তানা পরে গাছের গায়ে হাত বুলোতেই ফলগুলো ঝুরঝর করে আলগা হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। আমরা প্লাসটিকের ব্যাগে প্রায় শ'খানেক ফল ভরে নিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম। সুমাকে দিয়ে অবিলম্বে এই ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করানো দরকার। এ জিনিস এর আগে আমরা কখনো দেখিনি। আমার মন বলছে এই ফলই মানরোর চিঠির সেই আশ্চর্য উদ্ভিদ। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ সেটা বোঝাই যাচ্ছে; মেহগনির গাছ থেকে রস টেনে নিয়ে এই উদ্ভিদ জীবন ধারণ করে।

সুমার মিনিয়েচার ল্যাবরেটরি তৈরি, সে এর মধ্যে নীল ডুমুরের রাসায়নিক বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছে। এটা জানতে পেরেছি যে, এই ফল হাতে ধরলে কোনো ক্ষতি নেই। ক্যালেনবাখের তাঁবুতে গিয়ে তাকে একটা ফল দেখিয়ে এসেছি। সে সেটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশের টেবিলে রেখে দিল। বুঝতে পারছি এই ফল আবিষ্কারের বিশেষ মুহূর্তটি সে টেলিভিশনে তুলে রাখতে পারেনি বলে তার আপশোস। আমি তাকে একটা মিরাকিউরলের বড়ি দিয়ে এসেছি। তাকে যে করে হোক চাঙা করে তুলতেই হবে। নিজের দেশের ওষুধ ছাড়া কিছুই খেতে চায় না ক্যালেনবাখ কিন্তু এখন বেগতিকে পড়ে রাজি হয়েছে।

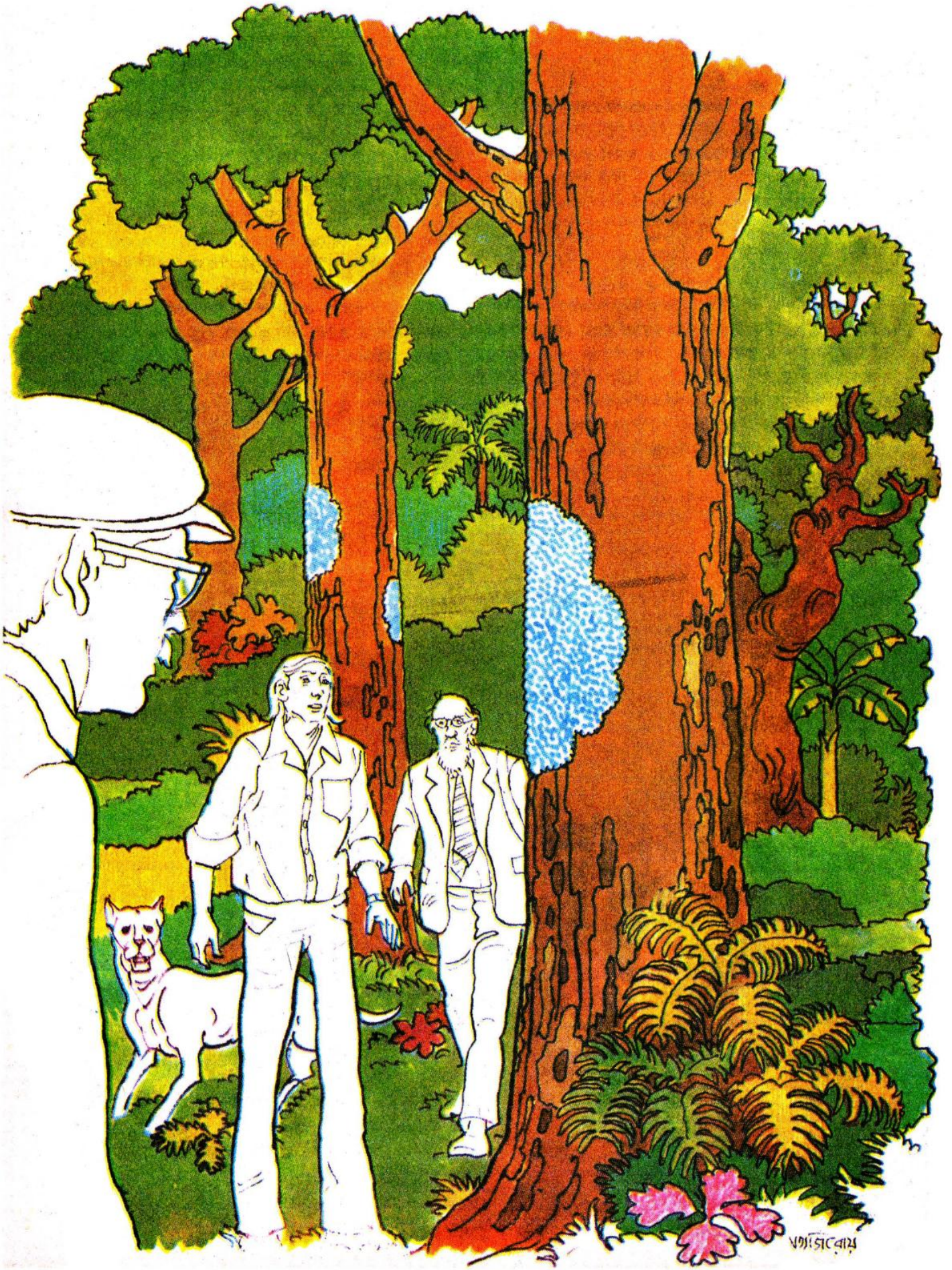

১৩ই মার্চ, রাত ন'টা

বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে যে আমাদের অভিযান বিফল হবে না। এর পরিণতি কী হবে অনুমান করা অসম্ভব, কিন্তু যেভাবে ঘটনার মোড় ঘুরছে তাতে মনে হয় কিছু চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা দেশে ফিরতে পারব।

আজ লাঞ্চে ক্যালেনবাখকে শুধু একটু চিকেন সুপ খেতে দিলাম। তার নাড়ী বেশ দুর্বল। এই দু-দিনের অসুখেই তার চেহারা দেখলে রীতিমত ভাবনা হয়। অথচ এই অবস্থাতেও সে জানতে চাইল সেই প্রাণীটার কথা। তার দেখা পেয়েছি কি আমরা ? সে প্রাণী কি আরো এগিয়ে এসেছে, না যেখানে ছিল সেখানেই আছে ?

টেলিকার্ডিওস্কোপ যন্ত্র অবিশ্যি আপাতত বন্ধই আছে। সুমা এখন একাগ্র মনে চালিয়ে যাচ্ছে ওই ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ। তার কাজ যে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে মাঝে মাঝে তার হুঙ্কার থেকে। আমি আর সন্ডার্স উদগ্রীব হয়ে দেখছি সুমার গবেষণা। যে প্রক্রিয়াটা চোখের সামনে ঘটছে সেটা আমাদের অজানা নয়। এই ফলে যে ক্রমে ক্রমে সমস্তরকম ভিটামিনের অস্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে সেটা দেখতেই পাচ্ছি। মানরোর যুগে ভিটামিন কথাটাই তৈরি হয়নি। বিজ্ঞান তখন শিশু, আর খাদ্যদ্রব্যের চর্চা শুরু হতে তখনো আড়াইশো বছর দেরি।

সাড়ে তিনটের সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে সুমা কেবল দুটি কথাই বলল। প্রথমে বলল "অ্যামেজিং", আর তার পরে তার পকেটের রুমালটাকে সিকি ইঞ্চি ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল "অ্যান্ড মিসটিরিয়াস"।

ইতিমধ্যে ক্যালেনবাখ যে কখন তার বিছানা ছেড়ে উঠে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা বুঝতেই পারিনি। তার দিকে চোখ পড়তে সে হাত বাড়িয়ে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "গ্রেট ! তোমার ওষুধের কোনো তুলনা নেই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ !"

"সে কী ? এই কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ?"

"দেখতেই তো পাচ্ছ," হেসে বলল বিল ক্যালেনবাখ।

আমার ওষুধ যে এমন অসম্ভব দ্রুত গতিতে অসুখ সারাতে পারে সেটা আমি নিজেও জানতাম না।

"আর এই নাও—এটা আমার টেবিলের উপর ছিল।"

"সে কী ! এ যে আমারই ওষুধের বড়ি !"

রহস্য সমাধান হতে সময় লাগল না। জ্বরের ঘোরে আমার বড়ি না-খেয়ে ক্যালেনবাখ খেয়েছে টেবিলে রাখা সেই নীল ফলটি। আর তাতেই এই আশ্চর্য আরোগ্য লাভ। আর ফলের গুণ যে শুধু আরোগ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে তা নয় ; ক্যালেনবাখের চাহনিতে এই দীপ্তি এর আগে কখনো দেখিনি। সন্ডার্স সুমাকে বলল, "তোমার গবেষণার আর কোনো প্রয়োজন নেই ; এখন এই ফল যত পারা যায় সঙ্গে নিয়ে চলো দেশে ফিরে যাই। এর চাষ করে আমরা সব ডাক্তারি কোম্পানিকে ফেল করিয়ে দেব !"

কথাটা সন্ডার্স রসিকতা করে বললেও সুমা জবাব দিল অত্যন্ত গম্ভীরভাবে। সে বলল যে তাকে এখনো গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। অন্তত আরো একটা দিন। ভিটামিনের বাইরেও আরো অনেক কিছু রয়েছে এই ফলের মধ্যে, যেগুলোর নাগাল ও এখনো পায়নি।

ক্যালেনবাখের পীড়াপীড়িতেই সুমাকে তার কাজ বন্ধ করে একবার টেলিকার্ডিওস্কোপটা চালু করতে হল। দেখা গেল প্রাণীটা ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই আছে। "বাট হিজ হার্টবীট ইজ স্লোয়ার," বলল সুমা।

সে তো শব্দ শুনেই বুঝতে পারছি। কাল ছিল পঞ্চাশ, আর আজ চল্লিশের নীচে।

"সর্বনাশ !" বলে উঠল ক্যালেনবাখ। "এ কি মরে যাবে নাকি ? এমন একটা প্রাণী এই দ্বীপে থাকতে তোমরা ওই ফলের পিছনে সময় নষ্ট করছ ?"

"ফল তো পেয়েই গেছি, বিল," বলল সন্ডার্স। "আমরা কালই দ্বীপের মাঝের অংশটার দিকে যাব। তুমি অসহিষ্ণু হয়ো না।"

ক্যালেনবাখ তাও গজগজ করতে করতে তার ক্যাম্পের দিকে চলে গেল।

১৪ই মার্চ

আজ আর আমাদের বেরনো হল না। সারাদিন ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাত। ক্যালেনবাখ অগত্যা তার ক্যামেরা দিয়ে আমাদেরই ছবি তুলল, আর টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে আমাদের সকলের ইন্টারভিউ নিল।

দুপুরে লাঞ্চের পর ডেভিড আমাদের সকলকে জলদস্যুদের গল্প শোনাল। সত্যি, ছেলেটার আশ্চর্য স্টক আছে এই সব গল্পের।

একটা দুঃসংবাদ এই যে, সুমা বলল ফলে ভিটামিন ছাড়া আর যাই থাক না কেন, সেটা এই খুদে ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করে বার করা সম্ভব না। সে কাজটা দেশে ফিরে গিয়ে বড় ল্যাবরেটরিতে করতে হবে। অবিশ্যি আমাদের এখানে আসার পিছনে যে প্রধান উদ্দেশ্য সে তো সফলই হয়েছে। কাজেই দেশে ফিরে যেতেও আর বেশি দিন বাকি নেই। আপাতত সুমা আমাদের এই ফল খেতে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে। একটা ফলেই যদি ক্যালেনবাখের কঠিন ব্যারাম এক ঘন্টার মধ্যে সারতে পারে তাহলে এই ফলের তেজ যে কীরকম সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। সুমার মতে, এই ফল খেলে উপকারের সঙ্গে অনিষ্টও হওয়া কিছুই আশ্চর্য না। বিস্ময়কর রকম ক্ষুধাবৃদ্ধিটা অপকার কিনা জানি না, কিন্তু ক্যালেনবাখ আজ লাঞ্চে একাই তিন টিন হ্যাম খেয়ে ফেলেছে।

১৫ই মার্চ, সকাল সাতটা

দুঃসংবাদ।

ক্যালেনবাখ একা বেরিয়ে পড়েছে কাউকে কিছু না বলে।

ডেভিড মানরোই খবরটা দিল আমাদের। সে আর ক্যালেনবাখ একই তাঁবুতে রয়েছে, অন্য দুটোর একটাতে আমি

আর সন্ডার্স, আর একটাতে তার যন্ত্রপাতি সমেত সুমা। ডেভিড সাড়ে ছটায় ঘুম ভেঙে দেখে ক্যালেনবাখের বিছানা খালি, এবং টেবিলের উপর তার ক্যামেরার যে সরঞ্জাম ছিল সেগুলোও নেই। তৎক্ষণাৎ তাঁবুর বাইরে এসে ডেভিড বার কয়েক ক্যালেনবাখের নাম ধরে ডাক দেয়। কিন্তু কোনো সাড়া পায় না। অবশেষে তার কুকুর রকেটের সাহায্য নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যালেনবাখের বালিশের পাশে পড়ে থাকা রুমালটা নিয়ে রকেটকে শোঁকায়। যখন দেখে যে রকেট সেই দূরের টিলাগুলোর দিকে ধাওয়া করেছে, তখন আবার তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনে।

সুমা সারারাত কাজ করে সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল ; তাকে তুলে খবরটা দেওয়া হয়। সে তৎক্ষণাৎ তার টেলিকার্ডিওস্কোপ চালু করে হলদে বাতির স্পন্দন দেখিয়ে প্রমাণ করে দিল যে, ক্যালেনবাখ ক্যাম্প থেকে তিন কিলোমিটার দূরে রয়েছে এবং ওই টিলাগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আমরা আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রওনা দেব। আজ দিন ভালো। আজ চার জনেই যাব। সন্ডার্সের আক্ষেপের শেষ নেই ; বারবার বলছে, "কী কুক্ষণেই না বেপরোয়া লোকটাকে সঙ্গে এনেছিলাম।"

১৫ই মার্চ,
বিকেল সাড়ে পাঁচটা

একসঙ্গে এতগুলো চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশে মাথার মধ্যেটা কেমন যেন সব ওলটপালট হয়ে যায়।

আমরা এখন দ্বীপের মধ্যিখানের সেই প্রস্তরময় টিলা অঞ্চল থেকে পুবে প্রায় দু কিলোমিটার এসে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসেছি। সন্ডার্স তার খাতায় নোট লিখছে। লন্ডনের তিনটে দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে সে চুক্তিবদ্ধ আমাদের এই অভিযান সম্পর্কে লেখার জন্য। এখানে এসে এই প্রথম সে খাতা খুলল।

ক্যালেনবাখকে পাওয়া যায়নি ; শুধু পাওয়া গেছে তার ক্যামেরার বাক্স আর টেপ রেকর্ডার। দুটোরই অবস্থা বেশ শোচনীয়। মুভী ক্যামেরাটা তার কোমরে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা থাকে, সে যদি সেই অজ্ঞাত প্রাণীর কবলে পড়ে থাকে তাহলে ক্যামেরা সমেতই পড়েছে।

ডেভিড সুমার কাছ থেকে তার জাপানী মিকিকি রিভলভারটা চেয়ে নিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর নুড়ি পাথর রেখে তার টিপ পরীক্ষা করে চলেছে। রকম দেখে মনে হচ্ছে আর দিন তিনেক অভ্যাস করলেই তার নিশানা জবরদস্ত চেহারা নেবে।

সুমা সমুদ্রতটে পায়চারি করছে। গুনে গুনে চল্লিশ পা এদিকে চল্লিশ পা ওদিকে। আট ঘন্টা ভ্রমণের পরও তার কাপড়ে একটি ভাঁজ পড়েনি, মাথার একটি চুলও এদিক ওদিক হয়নি।

তার কাঁধ থেকে যে চামড়ার ব্যাগটা ঝুলছে, তাতে রয়েছে তারই তৈরি এক আশ্চর্য অস্ত্র। এর নাম সুমাগান। লম্বায় এক হাত। ঘোড়ার বদলে রয়েছে একটা বোতাম, যেটা টিপলে গুলির বদলে বেরিয়ে আসে ছুঁচ লাগানো একটা ক্যাপসুল, যার ভিতরে রয়েছে সুমারই তৈরি এক মারাত্মক বিষ। এই ক্যাপসুল যে-কোনো প্রাণীর যে-কোনো অংশে প্রবেশ করলে তিন সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু।

এবারে আমাদের আশ্চর্য আবিষ্কারগুলোর কথা বলি। প্রথম আবিষ্কার হল এই যে এ-দ্বীপে যে ব্র্যান্ডন ও মানরো ছাড়া আরো মানুষ ছিল তার প্রমাণ পেয়েছি একটা গুহার মধ্যে ছড়ানো কিছু কঙ্কাল, আর বেশ কিছু গেলাস, বোতল, ছুরি, কানের মাকড়ি ইত্যাদি ধাতুর ও কাচের জিনিস থেকে। মনে হয় ব্র্যান্ডনের জাহাজের সবাই এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিল। জলদস্যুরা যে ধরনের তলোয়ার বা "কাটল্যাস" ব্যবহার করত, সে রকম কাটল্যাস পেয়েছি বাইশটা। দুঃখের বিষয় কোনো সিন্দুক পাওয়া যায়নি। তবে এ রকম গুহা এ-দিকটায় অনেক আছে ; তার কোন্‌টার মধ্যে কী রয়েছে কে জানে !

আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে এসে মিনিট দশেক পরিভ্রমণের পরেই রকেটের গর্জন শুনে এক জায়গায় গিয়ে দেখি ক্যালেনবাখের ক্যামেরার বাক্স আর টেপ রেকর্ডার পড়ে আছে। মনে হয় ও জিনিস-দুটোকে ফেলে হাল্‌কা হয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল। তারপরে সে রক্ষা পেয়েছে কিনা সেটা অবিশ্যি জানা যায়নি। ওখানে থাকতেই সুমাকে বলে টেলিকার্ডিওস্কোপ চালু করেছিলাম। ফলাফল যা পাওয়া গেল তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। আমাদের চেনা প্রাণী ছাড়া আর কোনো প্রাণীর হৃৎস্পন্দন পাওয়া যায়নি রিসীভারের মুখ চারিদিকে ঘুরিয়েও। এক যদি ক্যালেনবাখ এক কিলোমিটারের মধ্যে থেকে থাকে তাহলে আলাদা কথা ; কিন্তু সেখানে থেকে সে করছেটা কী ? সে কি জখম হয়ে পড়ে আছে ? তার কাছে পিস্তল আছে ; তার একটা ফাঁকা আওয়াজ করেও তো সে তার অস্তিত্বটা জানিয়ে দিতে পারে। প্রাণীটার হৃৎস্পন্দনের গতি আবার পঞ্চাশে ফিরে গেছে। আলোর রঙ হলদে আর সবুজের মাঝামাঝি ; অর্থাৎ প্রাণীটা রয়েছে এখান থেকে তিন কিলোমিটারের কিছু বেশি দূরে।

ক্যালেনবাখের জিনিস দুটো নিয়ে আমরা এখানে চলে আসি বিশ্রাম আর কফির জন্য। এখানে এসেই সুমা প্রথমে যে জিনিসটা করল সেটা হল ক্যালেনবাখের তোবড়ানো টেপ রেকর্ডারটাকে বালির উপর রেখে সেটাকে চালু করা। দিব্যি চলল। জাপানী জিনিস বলেই বোধ হয় সুমার মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। আমরা যন্ত্রটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদে ক্যালেনবাখের গলা শুনলাম।

"দিস ইজ বিল ক্যালেনবাখ। ১৪ই মার্চ, সকাল আটটা দশ। আমার একক অভিযান সার্থক হয়েছে। আমি এইমাত্র প্রাণীটির দেখা পেয়েছি। আমার সামনে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূরের গুহাটা থেকে সে বাইরে এসেছিল। মানুষের চেয়ে বড়। মনে হয় চতুষ্পদ। যদিও মাঝে মাঝে দু পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে। আমি গাছের আড়ালে থাকায় আমাকে দেখতে পায়নি।

ক্যামেরায় টেলিফোটো লেন্স লাগানোর আগেই প্রাণীটা আবার গুহায় ফিরে যায়। দূর থেকে দেখে তেমন ভয়াবহ কোনো জানোয়ার বলে মনে হল না। হাঁটার গতি দেখে মনে হচ্ছিল অসুস্থ, কিম্বা জরাগ্রস্ত। আমি খুব সন্তর্পণে গুহার দিকে এগোচ্ছি।"

এইখানেই বক্তব্য শেষ।

এবার আমাদের ফেরার সময় হয়েছে। কাল কী আছে কপালে কে জানে!

১৬ই মার্চ, সকাল সাড়ে ছ'টা

ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

কাল রাত আড়াইটায় রকেটের মুহুর্মুহু গর্জন আর সেই সঙ্গে ডেভিডের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি রকেট উত্তর দিকে মুখ করে গর্জন করে চলেছে এবং সেই সঙ্গে ডেভিডের হাতে ধরা লাগামে প্রচন্ড টান দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। অমাবস্যার রাত, তার উপর আকাশে মেঘ, কাজেই রকেটের এই অস্থিরতার কারণ জানা গেল না। সন্ডার্স তাঁবুতে ঢুকেছিল টর্চ আনতে কিন্তু তার আগেই রকেট ডেভিডকে টান মেরে বালির উপর ফেলে দিয়ে অন্ধকারে ছুট লাগাল উত্তর দিক লক্ষ করে। সুমা ইতিমধ্যে টেলিকার্ডিওস্কোপ চালু করেছে, কিন্তু তাতে কোনো ফল পাওয়া গেল না। সে প্রাণী যদি এসে থাকে তো এক কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, টর্চ ফেলেও কিছু দেখা যাচ্ছে না, কারণ, একটি ছোট টিলার পিছনে রকেট অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদেরও এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করা উচিত কিনা ভাবছি এমন সময় রকেটের চিৎকারে আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ চিৎকার আস্ফালন বা আক্রোশ নয়। এ হল আর্তনাদ।

এবার টর্চের আলোয় দেখা গেল রকেট ফিরে আসছে। ডেভিড ছুটে এগিয়ে গেল তার প্রিয় কুকুরের দিকে। আমরাও ছুটলাম তার পিছু পিছু। গিয়ে দেখি আর্তনাদের কারণ স্পষ্ট; রকেটের পিঠে গভীর ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানা গেল যে, প্রাণীটি শুধু জখম করেননি, নিজেও জখম হয়েছেন; রকেটের মুখে লেগে রয়েছে তার রক্ত।

রকেটের ক্ষতে যে ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে সে কালকের মধ্যেই সেরে উঠবে।

রকেটের মুখের রক্ত পরীক্ষা করে সুমা জানিয়েছে রক্তের গ্রুপ হল 'এ'। 'এ' গ্রুপের রক্ত যেমন মানুষের হয়, তেমনি অনেক শ্রেণীর বাঁদরেরও হয়। প্রাণীটি যে বানর শ্রেণীর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আধ ঘন্টা আগে গিয়ে তার পায়ের ছাপ দেখে এসেছি বালির উপর, আমাদের ক্যাম্প থেকে পঞ্চাশ গজ উত্তরে। পায়ের ছাপের সামনে রয়েছে মুঠো করা হাতের ছাপ। পায়ে পাঁচটা আঙুল, সাইজে মানুষের পায়ের চেয়ে সামান্য বড়।

আজকের অভিযানে এই হিংস্র জীবটির সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যে দ্বীপে এই অমৃতসদৃশ ফল, সেই একই দ্বীপে এই রাক্ষুসে বানরের বিভীষিকাময় কার্যকলাপ আমাদের সকলেরই মনে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার করেছে।

১৭ই মার্চ, রাত ন'টা

কাল সকালে আমরা ফিরে যাচ্ছি। মনের অবস্থা বর্ণনা করে লাভ নেই। কারণ, এ ধরনের অভিজ্ঞতার পরে সুখ-দুঃখ বিস্ময় ইত্যাদি মামুলি শব্দ ব্যবহার করে সে বর্ণনা সম্ভব নয়। আসলে এটা আমি লক্ষ করেছি যে আমার কোনো অভিযানই সম্পূর্ণ সফল বা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না ; যেমন চমকপ্রদ লাভও হয়, তেমনি আবার অপূরণীয় ক্ষতিও হয়। এবারের অভিযান সম্পর্কে একটাই সত্যি কথা বলা যায় যে, আমার জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, জ্ঞানের ভাণ্ডার, বিস্ময়ের ভাণ্ডার— এ সবই আরো পরিপূর্ণ হয়েছে।

কাল যেখানে ক্যালেনবাখের ক্যামেরার ব্যাগ আর টেপ রেকর্ডার পাওয়া গিয়েছিল, আজ সেখানে ফিরে গিয়ে সুমা টেলিকার্ডিওস্কোপ চালু করে দিল। আজও কেবল একটিমাত্র প্রাণীরই হৃৎস্পন্দন পাওয়া গেল যন্ত্রে। স্পন্দনের রেট মিনিটে পঞ্চাশ, আর বাতির রঙ কমলা। প্রাণী আমাদের পশ্চিমদিকে দুই পয়েন্ট চার কিলোমিটার দূরে রয়েছে। কিন্তু সে এক জায়গায় থেমে নেই, কারণ সুমাকে বারবার রিসীভারের মুখ ঘোরাতে হচ্ছে। প্রাণীটা যে দ্রুতগামী নয় সেটা ক্যালেনবাখের বর্ণনা থেকেই আমরা জেনেছি, সুতরাং সে যদি আমাদের দিকে আসেও, অন্তত আধ ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে আছে আরেকটু ঘুরে দেখার জন্য। ক্যালেনবাখ যে মরে গেছে একথা এখনো কিছুতেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। হয়ত সে কোথাও গুরুতরভাবে জখম হয়ে পড়ে আছে, এবং এক কিলোমিটারের মধ্যেই আছে বলে যন্ত্রে তার হৃৎস্পন্দন শোনা যাচ্ছে না।

কিন্তু আমাদের এ আশা নির্মমভাবে আঘাত পেল দশ মিনিটের মধ্যেই। একটা পয়েনসেটিয়া ফুলের ঝোপের পেছনে ক্যালেনবাখের মৃতদেহ আবিষ্কার করল জেরেমি সন্ডার্স। দেহ বলতে পুরো দেহ নয় ; নীচের দিকের বেশ কিছুটা অংশ নেই। সেটা যে এই রাক্ষুসে প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হয়েছে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্যালেনবাখের মুভী ক্যামেরা এখনো তার কোমরে স্ট্র্যাপ বাঁধা রয়েছে, তার লেনস ভেঙে চুরমার, তার সর্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু তাও সেটা রয়েছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমাদের জাপানী বন্ধুটির প্রতিক্রিয়া দেখে। "মে বি ইন্টারেস্টিং ফিল্ম" বলে সে ক্যামেরাটা ফিল্মসমেত খুলে নিল মৃতদেহ থেকে। আমরা এই বীভৎস অথচ করুণ দৃশ্য আর দেখতে পারলাম না। ক্যালেনবাখকে গোর দেবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু সেটা এখন নয় ; এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

সামনের ওই গুহাটার কথাই কি বলেছিল ক্যালেনবাখ ? একটা বেশ বড় টিলার গায়ে অন্ধকার গহ্বরটা আমাদের সকলেরই চোখে পড়েছে।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আমাদের ক্যাম্প থেকে এই অংশটাকে দেখে মনে হয় যে এখানে পাথর ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু কাছে এসে বুঝেছি যে, ফাঁকে ফাঁকে গাছও আছে। তবে এটাও আমরা বুঝেছি যে, সেই আশ্চর্য ফল সম্ভবত দ্বীপের ওই একটি বিশেষ জায়গাতে ছাড়া আর কোথাও নেই।

গুহাটার কাছাকাছি পৌঁছে ডেভিড আমাদের ছেড়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে আগেই তার ভিতরে প্রবেশ করল। গুহার লোভ ডেভিড সামলাতে পারে না। এ ক-দিনে যতগুলো ছোট-বড় গুহা আমাদের পথে পড়েছে, তার প্রত্যেকটিতে ডেভিড হাতে টর্চ নিয়ে ঢুকে তার ভিতরটা একবার বেশ ভাল করে দেখে এসেছে। এটা অবিশ্যি সে করে চলেছে গুপ্তধনের আশায়। অবশেষে আজকে যে তার আশা পূরণ হবে সেটা কি সে নিজেও ভেবেছিল ?

'ইয়ো হো হো !' বলে যে চিৎকারটায় সে তার আবিষ্কারের কথাটা আমাদের জানিয়ে দিল, এটা হল খাঁটি জলদস্যুদের চিৎকার। শুনে মনে হল বুঝি বা ডেভিডের দেহে মানরোর নয়, ব্র্যান্ডনের রক্ত বইছে।

চিৎকারের কারণটা অবিশ্যি একেবারে খাঁটি। পাইরেটের সিন্দুকের চেহারা আমাদের সকলেরই চেনা। ঠিক তেমনি একটি সুপ্রাচীন সিন্দুক রাখা রয়েছে গুহার এক কোণে। বাইরে থেকে বোঝা যায়নি এ-গুহার ভিতরটা এত বড়। এতে অন্তত একশোজন লোকের থাকার জায়গা হয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে ব্র্যান্ডনের দস্যুরা যে-সব গুহা ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান।

ডেভিড সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ ডালাটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। সে এগিয়ে গেছে ডালা খোলার জন্য, কিন্তু কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন তার হাত দুটোকে পাথর করে রেখেছে।

শেষে সন্ডার্স এগিয়ে গিয়ে ডালাটা খুলল, আর খোলামাত্র ডেভিড আরেকটা অমানুষিক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সুমা অবিশ্যি তৎক্ষণাৎ তার ডান হাতের তর্জনীর ডগাটা দিয়ে ডেভিডের কপালের ঠিক মাঝখানে তিনটে টোকা মেরে তৎক্ষণাৎ তার জ্ঞান ফিরিয়ে দিল। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ডেভিডের মূর্ছা যাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তার ছেলেবেলার সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে ; সিন্দুক বোঝাই হয়ে রয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রা ; ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডনের লুণ্ঠিত ধন।

ইতিমধ্যে আরেকটি আবিষ্কার আমাদের মধ্যে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এটিও একটি তোরঙ্গ— যদিও আগেরটার চেয়ে ছোট। এর গায়ে তামার পাতের অক্ষরে এখনো লেখা স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে— ডাঃ এইচ মানরো।

এই তোরঙ্গ খুলে তার ভিতর থেকে জীর্ণ জামাকাপড় আর কিছু ডাক্তারির জিনিসপত্র ছাড়া একটি আশ্চর্য মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেল— হেকটর মানরোর ডায়রি। ডায়রি শুরু হয়েছে এই দ্বীপে এসে নামার পরদিন থেকে। মানরো কীভাবে এখানে এলেন সে-খবরও এই ডায়রিতে আছে। আমাদের অনুমান একেবারে ভুল হয়নি। কংকুয়েস্ট জাহাজ জলদস্যুদের হাতে পড়ে জলমগ্ন হয়। মানরোকে ব্র্যান্ডনই উদ্ধার করে তার নিজের জাহাজে তোলে। তারপর তারা রওনা দেয় জামাইকা। পথে প্রচণ্ড ঝড়ে পড়তে হয় জাহাজকে। দিগভ্রম হয়ে জাহাজ ভুল পথে চলতে শুরু করে। এই সময় নাবিকদের মধ্যে ব্যারাম দেখা দেয়। সাতদিন পর ঐই অজানা

দ্বীপের কাছে এসে জাহাজডুবি হয়। ব্র্যান্ডন আর মানরো ছাড়া আরো তেত্রিশজন লোক কোনোমতে ডাঙার নাগাল পেয়ে আত্মরক্ষা করে। র‍্যাগল্যান্ড নামে একজন নাবিক ঘটনাচক্রে ওই নীল ফলের সন্ধান পায়। র‍্যাগল্যান্ড তখন অসুস্থ। এই ফল খেয়ে সে এক ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্যলাভ করে। তারপর এই ফল খেয়ে দলের সকলেরই ব্যারাম ম্যাজিকের মতো সেরে যায়। মানরো এই ফলের নাম দিয়েছিল অ্যামব্রোজিয়া অর্থাৎ অমৃত। এই দ্বীপের জানোয়ার আর পাখিও এই ফল খায় কি না সে প্রশ্ন মানরোর মনে জেগেছিল। সে লিখছে—

"আর কোনো জানোয়ার না হোক, বাঁদরে যে খায় সেটা আমি বুঝেছি তাদের স্বাস্থ্য ও ক্ষিপ্রতা দেখে। শুধু তাই না ; এখানকার বাঁদরগুলো উদ্ভিদজীবী নয়, এরা মাংস খায়। আমি এদের গিরগিটি আর ব্যাঙ ধরে খেতে দেখেছি।"

মানরোর এ-কথা বলার কারণ তার নিজের পরের কথাতেই পরিষ্কার হচ্ছে। সে সুস্থ অবস্থাতেই এ ফল খেয়ে দেখে লিখছে—

"আমি আজ অমৃতের স্বাদ পেলাম। অবিশ্বাস্য এই ফলের ক্ষুধাবৃদ্ধিশক্তি। আজ সকালে আমরা অত্যন্ত তৃপ্তির-সঙ্গে হরিণের মাংস খেলাম। ফলমূলের অভাব নেই এখানে, কিন্তু তাতে ক্ষুধা মেটে না। এই আশ্চর্য ফল কি এই অজানা দ্বীপেই থেকে যাবে ? পৃথিবীর লোক কি এর কথা জানতে পারবে না ?"

এর পরে ইঙ্গিত আছে, ডাক্তারের আর প্রয়োজন নেই দেখে ব্র্যান্ডন মানরোকে সরাবার চেষ্টা করছে। আত্মরক্ষার জন্য মানরো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে বুঝতে পারছে ব্র্যান্ডনের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। এদিকে খাদ্য-সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। দ্বীপের হরিণ মারা শেষ করে ব্র্যান্ডনের দস্যুদল পাখি বাঁদর ইত্যাদি শিকার করে খাচ্ছে। ফলমূল শাক-সবজিতে আর কারুর রুচি নেই।

সব শেষে মানরো যে কথাটা বলেছে সেটা পড়ে আমাদের মনে এক অদ্ভুত ভাব হল। সে লিখছে :

"আমি বোতলে চিঠি পাঠিয়ে ঠিক করলাম কিনা জানি না। এই ফলকে অমৃত বলা উচিত কিনা সে বিষয়েও আমার মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই তিন মাসের মধ্যে মানুষগুলো সব পশুতে পরিণত হতে চলেছে। আমিও কি পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছি ? এই যে চিরকালের জন্য রোগমুক্তি, আর তার সঙ্গে এই যে অদম্য ক্ষুধা, এটা কি মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর ?"

মানরোর ডায়রিটা শেষ করে আমরা সকলেই মন ভার করে গুহার মধ্যে বসে আছি, এমন সময় খেয়াল হল যে একবার টেলিকার্ডিওস্কোপটা চালিয়ে দেখা উচিত।

সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্র চালু করা হল, কিন্তু কোনো ফল পাওয়া গেল না। তার মানে প্রাণীটা এক কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছে।

ঠিক এই সময় আমিই প্রথম অনুভব করলাম গুহার ভিতরে একটা গন্ধ যেটা এতক্ষণ পাইনি। আমরা গুহার মুখটাতেই বসেছিলাম বাইরের আলোতে মানরোর ডায়রিটা পড়ার সুবিধা হবে বলে। গন্ধটা কিন্তু আসছে গুহার ভিতর থেকেই, আর সেটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার মানে গুহার ভিতরে পিছন দিকেও একটা ঢোকার রাস্তা আছে। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা, কারণ পায়ের শব্দ পাচ্ছি না এখনো।

এবারে একটা মৃদু শব্দ। একটা প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত হল। পরমুহূর্তে একটা রক্ত-হিম-করা হুঙ্কারের সঙ্গে অন্ধকার থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একটা পাথরের খণ্ড এসে পড়ল সন্ডার্সের মাথায়। সন্ডার্স একটা গোঙানির শব্দ করে সংজ্ঞা হারিয়ে গুহার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল, আর আমাদের অবাক করে দিয়ে ডেভিড মানরো সন্ডার্সের হাত থেকে পড়ে যাওয়া দো-নলা বন্দুকটা তুলে নিয়ে সেই অন্ধকারের দিকে লক্ষ করেই পর পর দুটো গুলি চালিয়ে দিল।

এবারে বাইরে থেকে আসা ফিকে আলোতে দেখলাম প্রাণীটাকে, আর শুনলাম তার মর্মভেদী আর্তনাদ। সে চার পা থেকে দুপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুটো লোমশ হাত বাড়িয়ে আমাদের দিকে ধাওয়া করে আসছে। আমি আমার অ্যানাইহিলিনটা বার করার আগেই একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ করে সুমাগানের একটা বিষাক্ত ক্যাপসুল প্রাণীটির বক্ষদেশে গিয়ে বিঁধল, আর মুহূর্তের মধ্যে সেটা নির্জীব অবস্থায় চিত হয়ে পড়ল গুহার মেঝেতে।

এই প্রথম সুমাকে উত্তেজিত হতে দেখলাম। সে চিৎকার করে বলে উঠল, "ওই ফলের বিশেষ গুণটা কী এবার বুঝে দেখ শঙ্কু। আমি বুঝেছিলাম, আর তাই তোমাদের খেতে নিষেধ করেছিলাম। এই ফল যে একবার খাবে এক অনাহার বা অপঘাত মৃত্যু ছাড়া তার আর মরণ নেই। এই প্রাণী একা এই দ্বীপের অন্য সমস্ত প্রাণীকে ভক্ষণ করে অবশেষে খাদ্যের অভাবে মরতে বসেছিল, ক্যালেনবাখকে খাদ্য হিসাবে পেয়ে তার মধ্যে আবার প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। এখন তার খিদে চিরকালের জন্য মিটে গেছে।"

এই বলে সুমা তার বাঁ হাতের কবজিটা প্রাণীটার দিকে ঘুরিয়ে হাতঘড়ির বোতামটা টিপতেই ঘড়ির কেন্দ্রস্থল থেকে একটা তীব্র রশ্মি বেরিয়ে প্রাণীটার মুখের উপর পড়ল।

"যাকে মৃত অবস্থায় দেখছ তোমরা," বলল সুমা, "তার বয়স ছিল চারশোরও বেশি।"

"ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন !" —গুহা কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল ডেভিড মানরো।

সন্ডার্সেরও জ্ঞান হয়েছে। আমরা চারজন চেয়ে আছি মৃত প্রাণীটির দিকে। এই দীর্ঘকায় লোমশ জানোয়ারকে আর মানুষ বলে চেনার উপায় নেই, কিন্তু এর ডান চোখের জায়গায় যে গভীর গর্তটা সুমার টর্চের আলোতে আরো গভীর বলে মনে হচ্ছে, সেটাই এর পূর্বপরিচয় ঘোষণা করছে।

ডেভিড মানরোর গুলিই একে প্রথম জখম করেছে, আর সুমার বিষাক্ত ক্যাপসুল এর হৃৎস্পন্দন বন্ধ করেছে।

এবারে আমার অস্ত্র শেক্সপিয়রের সমসাময়িক এই নৃশংস জলদস্যুকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিল।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

বিশ্ববরেণ্য

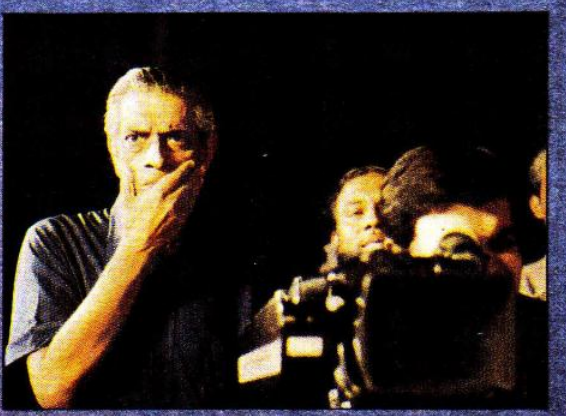

পিতা-পুত্র। ক্যামেরার চোখ রেখেছেন সন্দীপ রায়, পাশে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ রায়

পরিচালক

ক্যামেরায় চোখ রাখার আগে 'লাইট' বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ

সত্যজিৎ রায়

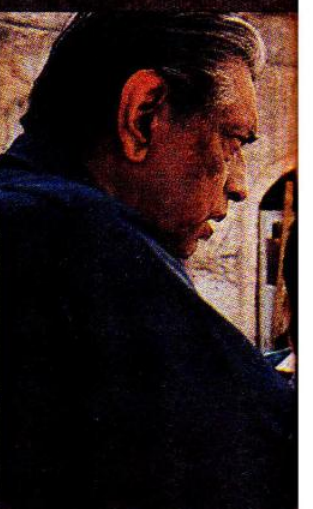

'লুক থ্রু'-র সেই
বিখ্যাত ভঙ্গি

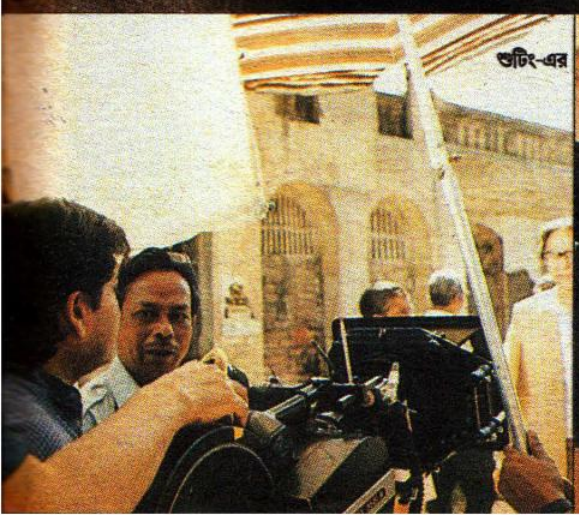

শুটিং-এর নানা মুহূর্ত

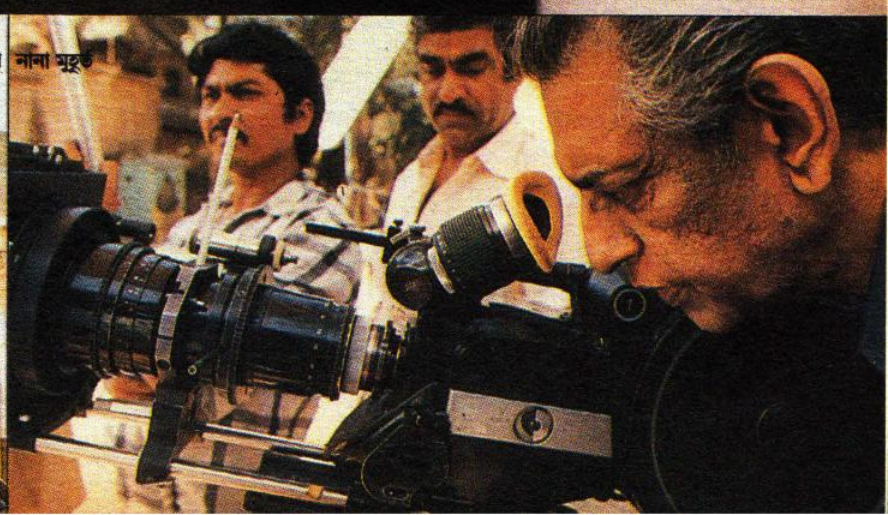

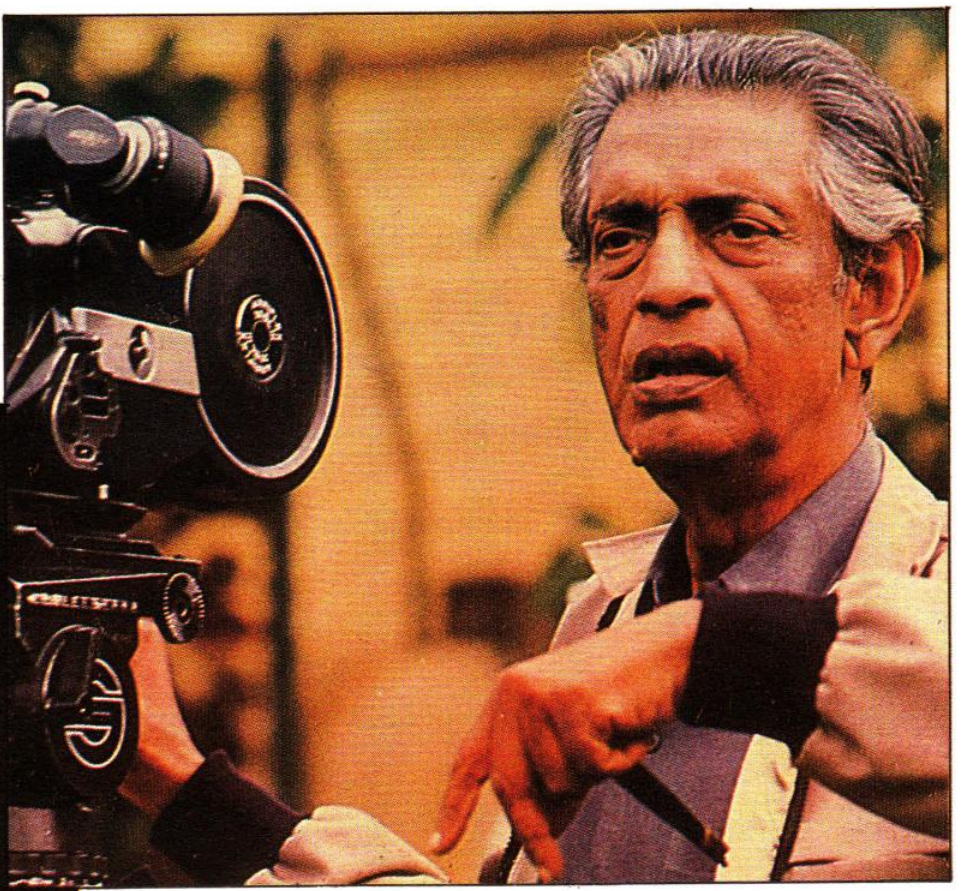

ভারতীয় সিনেমাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়

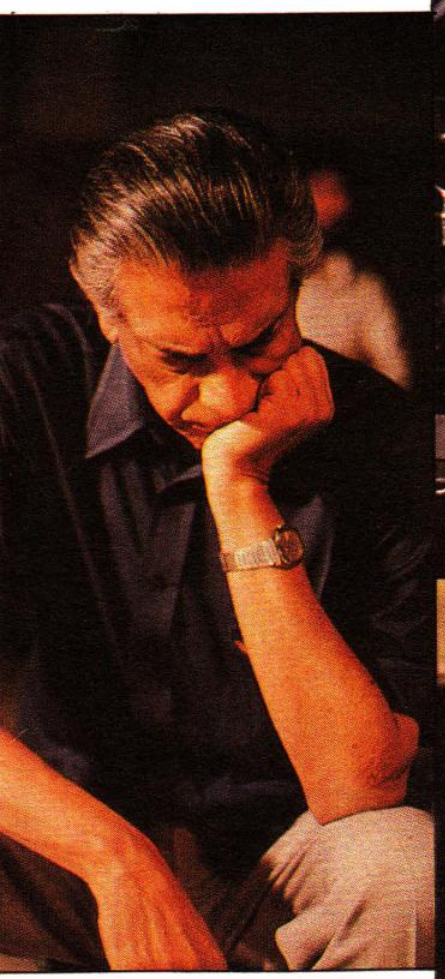

বয়স কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি

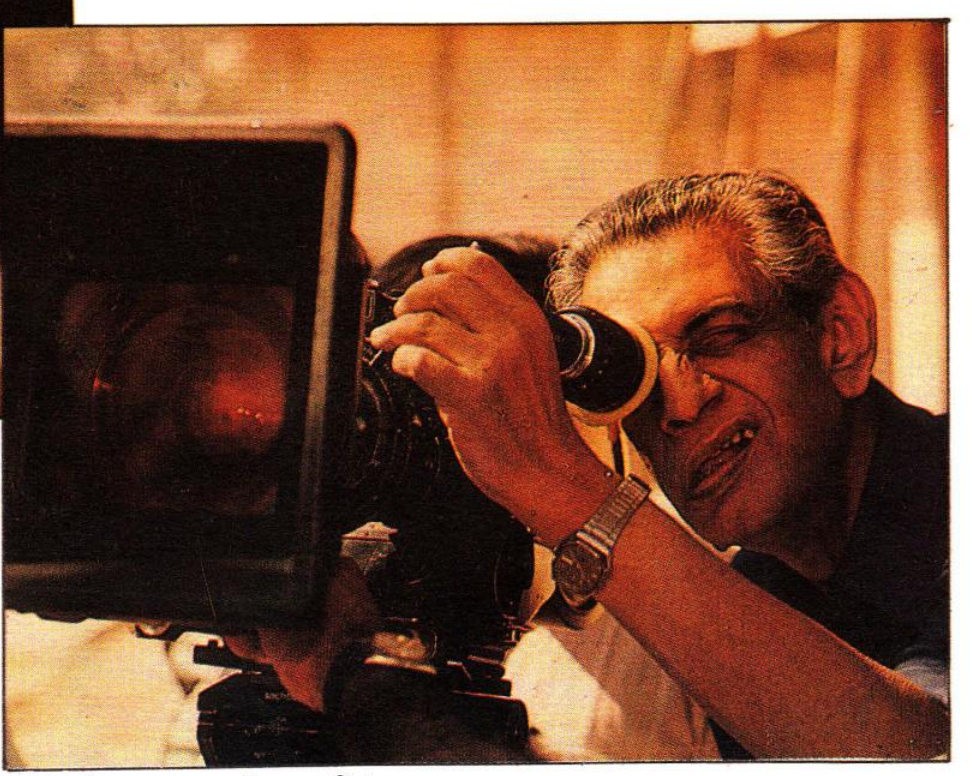

প্রতিটি শটের পেছনে থাকত গভীর ভাবনা-চিন্তা

ফোটো :
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
হীরক সেন

(সিনেমার কথা ❑ ১০ পাতার পর)

তেমনি অবাক হয়েছি, আর সেই সঙ্গে মনে হয়েছে যে সিনেমায় বোধহয় যা ভাবা যায় তাই দেখানো যায়— যেমন গল্প লিখিয়ে যা ভাবেন তাই লিখতে পারেন।

১৯২৯ সনে—কথা নেই বার্তা নেই—এসে গেল 'টকি' বা কথা-বলা ছবি। তখনকার দেখা একটা ছবির কথা মনে আছে যার কিছুটা ছিল টকি আর কিছুটা সাইলেন্ট ; অর্থাৎ মাঝে মাঝে ঠোঁট নাড়লে কথা বেরোচ্ছে, আর মাঝে মাঝে বেরোচ্ছে না। এ রকম কেন ? আসলে 'টকি' জিনিসটা আবিষ্কার হয় হঠাৎ, আর সেটা যখন ঘটে, তখন অনেক সাইলেন্ট ছবি অর্ধেক তোলা অবস্থায় ছিল। এই সব ছবি যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁরা ভড়কে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাকি অর্ধেক ছবিতে কথা জুড়ে দিয়ে না-এদিক না-ওদিক অবস্থায় সেগুলো বাজারে ছেড়ে দিলেন।

প্রথম দিকের পুরোপুরি 'টকি' ছবির বিজ্ঞাপনে সব সময়েই লেখা থাকত '100% Talkie'। ক্রমে যখন সাউন্ড সম্পর্কে লোকের চমক কেটে গেল, আর সাইলেন্ট ছবি তোলা একদম বন্ধ হয়ে গেল তখন আর বিজ্ঞাপনে ও কথাটা লেখার কোনো প্রয়োজন রইল না।

গত বিশ বছরের মধ্যে সিনেমায় আরো অনেক নতুন আবিষ্কার ও উন্নতির কথা আমরা জানি। এখন যেমন সুন্দর রঙীন ছবি তৈরি হয়, আগে তেমন হত না। কার্টুন ছবির ব্যাপারে ওয়াল্ট্ ডিজনি ছাড়াও আরো অনেকে অনেক কিছু করেছেন। পুতুলকে কায়দা করে 'জ্যান্ত' (animate) করে 'পাপেট' ছবিও তোলা হয়েছে অনেক। বছর দশেক আগেও সিনেমার ছবির চেহারা লম্বা-চওড়ায় ছিল এই রকম—

আজকাল এর চেয়ে অন্য অনেক রকম চেহারা দেখা যায়, যার আবার আলাদা আলাদা নামও দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর আগের চেহারাটার তুলনায় এইরকম—

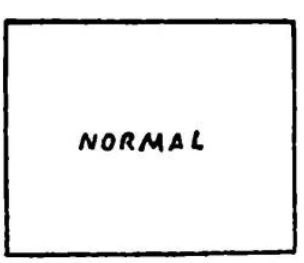

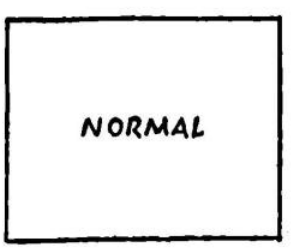

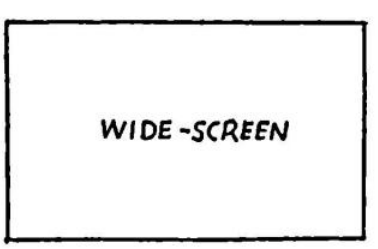

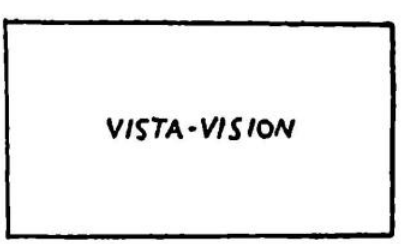

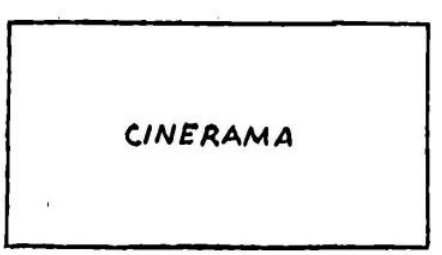

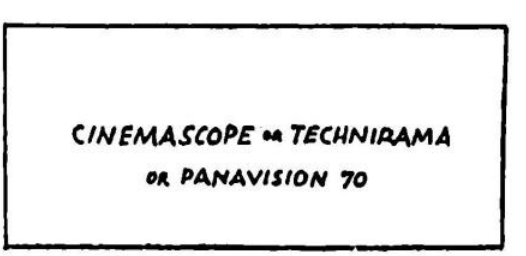

এ ছাড়া ছবি তোলার যন্ত্রপাতি যে কত হয়েছে নতুন রকম তার কোন ইয়ত্তাই নেই।
ছেলেবেলার যে ব্যাপারটা জানার সুযোগ হয়নি, কিন্তু আজ খুব ভালো ভাবেই জানি, সেটা হল এই যে সিনেমা তৈরির মত মেহনতের কাজ খুব কমই আছে। যেমন তেমন করে ছবি তুলতে গেলেও অনেক হ্যাঙ্গাম, আর ভালো করে তুলতে গেলে ত কথাই নেই। খুব সামান্য দৃশ্যের পিছনেও অনেক ভাবনা, অনেক খাটুনি আর অনেক খরচ থাকতে পারে। তবে এটাও ঠিক যে ছবি তোলার কাজে যেমন মজাও আছে, তেমন মজা আর কোন খাটুনির কাজে আছে কি না জানি না। ছবি তৈরির খুঁটিনাটির কিছুটা জানতে পারলে এই মজার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। পরে তোমাদের এ বিষয় আরো কিছু বলব।

(২)

সিনেমা তৈরি করতে গেলে প্রধানত দুটো জিনিসের দরকার। প্রথম দরকার হল সিনেমার যন্ত্রপাতি, আর তারপর, সেগুলো কী করে ব্যবহার করতে হয় সেটা জানা দরকার।
ছবি আঁকার যন্ত্রপাতি হল রং তুলি কাগজ পেনসিন—এই সব। কিন্তু এসব জিনিস যে-কোনো লোকের হাতে দিয়ে দিলেই কি আর সে ছবি আঁকতে পারবে? আঁকতে জানলে তবেই পারবে। গলা সব মানুষেরই আছে, কিন্তু গানের গলা কি সকলের থাকে? গানের বেলা গলাই হল যন্ত্র। তেমনি নাচের বেলা হল হাত পা চোখ মুখ ইত্যাদি শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নাচ, গান, ছবি আঁকা—এ সবই কেউ কেউ আপনা থেকেই পারে। যারা পারে না, কিন্তু করতে চায়, তাদের শিখে নিতে হয়।
কিন্তু সিনেমার কাজটা আরো অনেক বেশি ঝামেলার। এটা যে শুধু না-শিখে হয় না তা নয়, একজন লোকের পক্ষে একা এ কাজটা করা সম্ভব নয়। যে পরিচালনা করবে (ডিরেক্টর) তার সঙ্গে তার দলে আরও লোকের দরকার। তাদের এক একজনে এক এক রকম কাজ করে। সকলের উপরে থাকেন পরিচালক। এই সকলের কাজ মিলে ছবি তৈরি হয়।
সিনেমার কাজে ঝামেলা বেশি কেন জানতে হলে অন্য সব শিল্পের সঙ্গে সিনেমার একটা বড় তফাতের কথা বলতে হয়। একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা সহজে বোঝা যাবে।—
তোমাদের মধ্যে যারা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি' বা তার ছোটদের সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' পড়েছ, তারা ইন্দির ঠাকরুণের কথা নিশ্চয়ই জান। বিভূতিভূষণ তাঁর বইয়ে ইন্দির ঠাকরুণের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : 'পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।' এ ছাড়া বুড়ির ঘর আর জিনিসপত্তরের কথাও বিভূতিভূষণ লিখেছেন : 'হরিহরের পূর্বের ভিটায় খড়ের ঘর অনেকদিন অমেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ঘরটাতে বুড়ি থাকে। একটা বাঁশের আলনায় খান দুই ছেঁড়া ময়লা থান। ...একপাশে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও কয়েকখানা ছেঁড়া কাঁথা। একটি পুঁটুলিতে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা। ... একটা পিতলের ঘটি, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটির ভাঁড়...'
আমাকে যখন 'আম আঁটির ভেঁপু' বইয়ের ছবি আঁকতে হয়েছিল, তখন ইন্দির ঠাকরুণের ছবি আমি এই সব বর্ণনা থেকে বাড়িতে বসে বসে নিজের মন থেকেই এঁকেছিলাম। কিন্তু যখন 'পথের পাঁচালি' ফিল্ম করব বলে ঠিক করলাম, তখন কাজটা হয়ে গেল অনেক কঠিন। কারণ গাল-তোবড়ানো বুড়ি জোগাড় করা চাই, যিনি ইন্দির ঠাকরুণ সেজে অ্যাক্টিং করবেন, ইন্দিরের মত হাঁটবেন চলবেন, কথা বলবেন, যাঁকে দেখে লোকের বইয়ের বুড়ির কথা মনে হবে, আর তাদের মন বলবে—হ্যাঁ, এই ঠিক ইন্দির ঠাকরুণ।
বুড়ির সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্যি ঘটি বাটি মাদুর ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি, পোড়ো বাড়ি বাঁশবন ডোবা, এমন কি পুরো একটি গ্রামও চাই, যার চেহারার সঙ্গে বইয়ের নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের চেহারা মিলবে। এছাড়া আরো অন্য লোকজন ত আছেনই। বুঝতেই পারছ কাজটা সহজ নয়। আর এগুলো হচ্ছে ছবি তোলা শুরু করার আগে একেবারে গোড়ার কাজ।
পথের পাঁচালি যদি থিয়েটার করা হত তাহলেও অবিশ্যি একজন ইন্দির ঠাকরুণের দরকার হত। কিন্তু থিয়েটারে অনেক সময় কমবয়সী লোকেরাও রং মেখে মেক-আপ করে বুড়ো বুড়ি সেজে অ্যাকটিং করে। সেটাতে খুব এসে যায় না, কারণ থিয়েটার যারা দেখে তারা কিছুটা দূর থেকেই দেখে, তাই মেক-আপটা ততটা ধরা যায় না। সিনেমায় যারা অ্যাকটিং করে তাদের মুখ অনেক সময় খুব কাছ থেকে দেখানো হয়। তাই মেক-আপ অনেক সময় ভীষণভাবে ধরা পড়ে যায়। আর ধরা পড়লেই সব মজা মাটি।
সিনেমার সঙ্গে থিয়েটারের তফাতটা এই ফাঁকে আরেকটু বলে নিই। থিয়েটারে স্টেজটা পুরোপুরিই ফাঁকি, আর এই ফাঁকিটা বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে লোকে মেনে এসেছে। স্টেজের উপর যখন লোকে নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামের গল্প দেখতে যাবে, তখন কি আর এই ভেবে যাবে যে সেখানে আসল গ্রামের ঘর বাড়ি মাঠঘাট দেখবে? সবাই জানে যে এটা সম্ভবই না, তাই কেউ আর সেটা আশাও করে না। থিয়েটারে তাই অনেক কিছুই আমাদের কল্পনা করে নিতে হয়—ফাঁকগুলো মনে মনে পুরিয়ে নিতে হয়, ফাঁকিটাকে আসল বলে ভেবে নিতে হয়।
কিন্তু সিনেমায় আমরা আসল জিনিসেরই ছবি দেখব বলে আশা করি। যদিও সেটাও থিয়েটারের মতই ঘরের মধ্যে বসে দেখি, কিন্তু এটাও জানি যে ছবিগুলো ত আর সব বন্ধ ঘরের মধ্যে তোলা হয়নি। তাই যদি হত, তাহলে ত সিনেমা না দেখে থিয়েটার দেখাই ভালো ছিল। আসলে, সেই যে প্রথম সিনেমার ছবিতে লোকে ঘরে বসে চলন্ত ট্রেনের ছবি দেখেছিল, সেই থেকেই লোকে ধরে নিয়েছে যে সিনেমায় তারা বাড়ি ঘর মাঠ ঘাট নদী বন সবই যেমনটি হয় তেমনটি দেখবে।
তবে, সিনেমাতেও মাঝে মাঝে ফাঁকি দিতে হয়, নকলকে আসল বলে চালাতে হয়, কিন্তু সেটা এমন ভাবে করতে হয় যাতে ফাঁকি ধরা না পড়ে। লোকে ছবি দেখে দেখে আজকাল অনেক বেশি চালাক হয়ে গেছে, কাজেই, যে সিনেমা করবে সে যদি আরও বেশি চালাক না হয় তাহলেই ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। পরে তোমাদের এই সব ফাঁকির কথা কিছু বলব।
আগে একটা খুব জরুরী কাজের কথা বলি। এ কাজটাও সিনেমা তোলা শুরু হবার আগেই করতে হয়। এটা লেখার কাজ। এই লেখাটার উপর ভর করেই ছবিটা তোলা হয়। একে বলে চিত্রনাট্য, আর সেটা যে লেখে তাকে বলে চিত্রনাট্যকার।

চিত্রনাট্য (Scenario বা Screenplay)
যে সব ছবি তোমরা দেখ (এখানে 'ছবি' বলতে সিনেমাকেই বোঝাচ্ছি), তার বেশির ভাগই লক্ষ্য করবে কোন গল্প বা উপন্যাস থেকে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদের সকলের গল্প বা উপন্যাস থেকেই ছবি করা হয়েছে। এ ছাড়া অবিশ্যি সিনেমার জন্যে আলাদা করেও গল্প লেখা হয়। আবার অনেক সময় বিখ্যাত লোকদের জীবন নিয়ে অথবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা থেকেও সিনেমা হয়।
যাই হোক না কেন, সব গল্প বা ঘটনাকেই ছবি তোলার আগে সিনেমার মতো করে লিখে নিতে হয়। এইভাবে লিখে যে জিনিসটা তৈরি হয়, তাকে বলে চিত্রনাট্য।

গল্প-উপন্যাস বইয়ে যেভাবে লেখা থাকে, সিনেমায় ঠিক হুবহু সেইভাবে তোলা প্রায় কখনই সম্ভব হয় না। অনেক বড় উপন্যাস আছে যার পুরোটা ছবিতে রাখতে গেলে সেটা এত বড় হয়ে যাবে যে সে-ছবি আর কেউ ধৈর্য ধরে বসে দেখবে না। পথের পাঁচালি বইয়ের সবটা ছবিতে রাখতে গেলে সেটা অন্তত দশ ঘন্টার ছবি হত। গল্পকে সিনেমার উপযোগী করে সাজিয়ে নেওয়ার কাজ হল চিত্রনাট্যকারের কাজ।

যে চিত্রনাট্য লিখবে, বুঝতেই পারছ তাকে সিনেমার ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবেই জানতে হবে। একটা কথা তাকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে, সেটা হল—যে, চিত্রনাট্য যেটা লেখা হল, সেটা যখন ছবি হবে তখন আর সেটা পড়বার জিনিস থাকবে না, সেটা হয়ে যাবে দেখবার আর শোনবার জিনিস। চিত্রনাট্যকার যদি লেখেন—'হরিবাবুর ঘুম থেকে উঠেই মনে হল তাঁর আজ তাড়াতাড়ি আপিস যাওয়া দরকার'—তাহলে বলতে হবে তিনি সিনেমার ব্যাপারটা ঠিক বোঝেননি। কারণ, সিনেমায় হরিবাবুকে ঘুম থেকে উঠতে দেখানো যায়, কিন্তু তখন তাঁর কী মনে হল সেটা আমরা কী করে জানব ?

চিত্রনাট্যকার যদি লিখতেন—'হরিবাবু ঘুম থেকে উঠে চাকরকে ডেকে বলবেন—ওরে জগা, আমার স্নানের জলটা চট করে দিয়ে দেতো, আমায় একটু তাড়াতাড়ি আপিস যেতে হবে'—তা হলে জিনিসটা চিত্রনাট্যের পক্ষে ঠিক হত। এক একটা জিনিস আছে যেগুলো সিনেমায় খুব সহজেই কথা না বলে বোঝানো যায়। একজন লোকের চেহারা, তার বয়সের আন্দাজ, সে গরীব না বড়লোক, বাঙালি না বিদেশী—এসব কিছুই একবার লোকের চেহারাটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এক একটা জিনিস বোঝানো ভারী মুস্কিল হয়। যেমন, 'পথের পাঁচালি' বইয়ে এক জায়গায় বলা হয়েছে, ইন্দির ঠাকরুণ ছিলেন হরিহরের দূর সম্পর্কের বোন। এটা ছবিতে কী করে বোঝানো যাবে ? ইন্দির বয়সে হরিহরের চেয়ে অনেক বড়। যারা গল্পটা জানে না, তারা ছবিতে দুজনকে পাশাপাশি দেখলে হয়ত ইন্দিরকে হরিহরের মা বা মাসি পিসি ভেবে বসতে পারে। হরিহর যদি ইন্দিরকে দিদি বলে ডাকে, তাহলেও সে যে আপন দিদি না দূর সম্পর্কের দিদি তা কী করে বুঝব ? এখানে কোনো একটা সুযোগে কারুর মুখ দিয়ে এই দূর সম্পর্কের বোনের ব্যাপারটা বলিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আরো একটা উদাহরণ দিই। কোন গল্পের হয়ত প্রথমেই বলা হল—রাম বড় ভালো ছেলে। লেখায় এটা পড়লেই আমরা মেনে নিই যে রাম ভালো ছেলে। কিন্তু সিনেমায় যদি এ-গল্প বলা হয়, তাহলেই গোড়াতেই এক কথায় রাম ভালো ছেলে বোঝানোর কোন উপায় নেই। রাম যতক্ষণ না এমন একটা কিছু করছে যাতে প্রমাণ হয় সে ভালো ছেলে, ততক্ষণ সে ভালো না খারাপ সেটা বোঝাই যাবে না। রামের চেহারার মধ্যে একটা ভালোমানুষী ভাব থাকতে পারে, কিন্তু সেতো অনেক দুষ্টু ছেলের মধ্যেও থাকে। অন্য কারুর মুখ দিয়ে যদি বলানো হয় যে রাম ভালো ছেলে, তাহলে কিছুটা কাজ হতে পারে কিন্তু কথাটা কে বলবে সেটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। যে কোন লোকের চেয়ে যদি রামের বাবা মা, বা তার খুব কাছের কোন লোক সেটা বলে তাহলে আরো ভালো, কারণ তাঁরা রামকে রোজ দেখছেন বলে অন্য লোকদের চেয়ে বেশি জানেন। কাজেই তাঁদের কথার দাম আছে। কিন্তু সিনেমাতে দেখা গেছে যে মুখে বলার চেয়ে কাজে করিয়ে দেখানোতে অনেক বেশি কাজ হয়। চীনেদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে—একটা ছবি এক হাজার কথার সমান।

সিনেমাতেও এই কথাটা খাটে। তাই রামের বাবা যদি বা বলেন যে রাম ভালো ছেলে, যতক্ষণ না রামকে একটা ভালো কাজ করতে দেখি, ততক্ষণ আমাদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে।

তোমরা একটু ভেবে দেখবে কি, যে রাম 'ভালো ছেলে'—এই জিনিসটা খুব পরিষ্কার ভাবে শুধু দেখিয়ে কী ভাবে বোঝানো যায় ? বুঝতেই পারছ, রামকে দিয়ে একটা কোনো ভালো কাজ করাতে হবে—কিন্তু সেটা কী কাজ তা যদি তোমরা আমায় লিখে জানাও ত খুব ভালো হয়। রামের বিষয় আরো কয়েকটা জিনিস তোমাদের বলে দিচ্ছি—ধরে নাও যে তার বয়স বারো, সে গ্রামে থাকে, তার এক বুড়ো দাদু ছাড়া আর কেউ নেই। গল্পের শুরু হচ্ছে সকালে, রাম ইস্কুলে রওনা হচ্ছে। বাদবাকি তোমরা নিজের ইচ্ছামত বানিয়ে নিও।

তোমরা খেটে ভেবে যা বার করবে সেটা একটা খাতার পাতায় বা ফুলস্ক্যাপের একদিকে লিখে সন্দেশ-এ পাঠিয়ে দিও। খামের উপর বাঁ দিকের কোণে 'রাম' লিখে দিও। ১লা মার্চের বেশি দেরি কোর না পোস্ট করতে।

তোমাদের লেখা নিয়ে সিনেমার কথায় আলোচনা করব। তেমন ভালো লেখা হলে পুরস্কার দেওয়া হবে।

(৩)

গতবার তোমাদের 'রাম ভালো ছেলে' বোঝানোর জন্য একটা চিত্রনাট্য লিখতে বলেছিলাম। অনেকেই সেটা লিখে পাঠিয়েছে, আর তার মধ্যে কয়েকজনের লেখা সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে। সামনের বারে কার কার লেখা ভালো হয়েছে জানাবো, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব, আর যারটা সব চেয়ে ভালো হয়েছে সেটা ছাপিয়েও দেবো। এবারে চিত্রনাট্যের পরে কী আসে সেটা বলি।

চিত্রনাট্য শেষ হয়ে গেলে লেখাজোখার কাজ মোটামুটি শেষ হল বলা যেতে পারে। 'শুটিং' (বা ছবি তোলা) শুরু হবার আগে অবিশ্যি এই চিত্রনাট্যের উপরেও আরো কিছুটা কাজ করার থাকে—সেটা হল, এই চিত্রনাট্যকে ছবিতে তোলার সুবিধের জন্য টুক্‌রো টুক্‌রো করে বিভিন্ন 'শট'-এ ভাগ করা। এটার প্রয়োজন কেন হয় সেটা একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। ধরো, চিত্রনাট্যতে বলা হয়েছে 'রাম ঘুম থেকে উঠে তার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো'। এই ঘটনাটা যদিও লেখার সময় মাত্র একটা বাক্য বা Sentence এই বুঝিয়ে দেওয়া হল, ছবি তোলার সময় দেখা যাবে যে এটাকে দুটো 'শট্'-এ ভাগ করলে সুবিধা হয়। সেই দুটো শট্‌কে বর্ণনা করতে গেলে এই রকম দাঁড়াবে—

শট্ (১) রামের শোবার ঘরের ভিতর।
রাম ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে নেমে পাশের দরজা দিয়ে এগিয়ে গেলো।

শট্ (২) রামের বাড়ির বারান্দা।
রাম শোবার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় এলো।

এমনও হতে পারে যে এই শট্-এর একটা হয়ত আজ নেওয়া হল, আরেকটা নেওয়া হল দু মাস পরে। কিন্তু শট্-দুটো যখন একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে ফেলা হল, তখন দেখা গেল সে জোড়াটা আর টেরই পাওয়া যাচ্ছে না। দুটো মিলে একেবারে একটা গোটা sentence এর মতো হয়ে গেছে।

এইভাবে—যেমন একটা গল্প চলতে অনেকগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো sentence এর দরকার হয়—তেমনি অনেকগুলো আলাদা আলাদা শট্-কে জুড়ে তবে একটা সিনেমার গল্পকে বলা যায়। হিসেব করলে দেখা যায় যে এক একটা ছবিতে গড়ে প্রায় চার পাঁচশ আলাদা আলাদা শট্ থাকে। কোন পরিচালক যদি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করেন, তাহলেও তাঁর পক্ষে দিনে পনের বিশটার বেশি শট্ নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই সাধারণতঃ দেখা যায় যে একটা খুব সাদাসিধে ছবি করতে প্রায় ২৫/৩০ দিন শুটিং করার প্রয়োজন হয়।

আর শুধু শুটিং করলেই ত কাজ ফুরিয়ে গেলো না। যে ছবি তোলা হল তাকে ডেভেলাপ করতে হবে, প্রিন্ট করতে হবে, সেগুলোকে দেখে তার মধ্যে ভালো মন্দ বাছাই করতে হবে। তারপর সেগুলো কাটা ছাঁটা জোড়া ও আরো খুঁটিনাটি অনেক কাজ করে, একটা ছবিকে দাঁড় করাতে কমপক্ষে তিন-চার মাস লেগে যায়। এই তিন-চার মাসে অনেক লোক তাদের হাতের কাজের ছাপ ছবিতে রেখে যায়। একটা ছবি দেখতে গিয়ে আসল গল্প শুরু হবার আগে যে নামের তালিকাটি তোমরা দেখো (যাকে বলে credit list)—সেটা হচ্ছে এই সব কাজের লোকদের নাম।

এই কর্মীদের সাধারণত দু ভাগে ভাগ করা হয়। এক হল যারা ক্যামেরার সামনে থাকেন—অর্থাৎ যাদের চেহারা আমরা ছবিতে দেখি। এরা হলেন অভিনেতা—তা সে ছেলেই হোক বুড়োই হোক বা কুকুর বেড়ালই হোক্।

অন্য দলের কর্মীরা থাকেন ক্যামেরার পিছনে। এদের প্রত্যেকেরই এক একটা নাম আছে, সে নামগুলো হল—

(১) পরিচালক (Director):-

ছবি তৈরির সব ব্যাপারেই এর কর্তৃত্ব করার অধিকার আছে, কারণ তোলা আর জোড়া শেষ হলে পর পুরো ছবিটা কেমন দাঁড়াবে, সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা একমাত্র পরিচালকেরই থাকে। অভিনয়টা কেমন ধরনের হবে, ক্যামেরা কোনখানে বসিয়ে ছবি তোলা হবে, দৃশ্যগুলি কী ভাবে বিভিন্ন শট্-এ ভাগ করা হবে—ইত্যাদি সবই পরিচালকের জানার কথা।

পরিচালকের সঙ্গে তিন চারজন সহকারী থাকে যারা অনেক ব্যাপারেই তাকে সাহায্য করতে পারে।

(২) ক্যামেরাম্যান বা আলোকচিত্রশিল্পী :-

ইনি ছবি তোলেন। এঁকে কোন কোন সময়ে খোলা রাস্তাঘাট বন পাহাড় নদীর ধার ইত্যাদি আসল জায়গায় গিয়ে ছবি তুলতে হয়। আবার কোনো কোনো সময় স্টুডিওর ভিতরে নকল ঘর বাড়িতে নকল দিন বা নকল রাতের আলো তৈরি করে ছবি তুলতে হয়। এই দুটো কাজই এর জানা দরকার।

ক্যামেরাম্যানেরও দু একজন সহকারী থাকে।

(৩) শব্দ-যন্ত্রী (Sound Recordist):-

ক্যামেরাম্যান যেমন দৃশ্যের ছবি তুলে রাখেন, তেমনি শব্দ-যন্ত্রী মাইক্রোফোন দিয়ে একটি দৃশ্যের কথাবার্তা হাঁটা চলা হাঁচি কাশি হাসিকান্না চড়চাপড় পাখির ডাক মেঘের ডাক নাক ডাকানি সব কিছু যা কানে শোনা যায় তাই তুলে রাখেন।

এঁরও দু-একজন করে সহকারী থাকেন।

(৪) শিল্প নির্দেশক (Art director):-

ইনি স্টুডিওর ভেতর ফাঁকি-দেওয়া নকল বাড়িঘর তৈরি করেন এমন ভাবে যে ছবিতে তাকে আসল বলে মনে হয়। কাজেই বুঝতে পারছ যে এর কাজটাও নেহাৎ ফেলনা নয়। কাজের যোগান দেবার জন্য এরও সহকারী থাকেন।

(৫) সম্পাদক (Editor):-

মাসিকপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে কিন্তু এই সম্পাদকের কোনই মিল নেই। ক্যামেরায় তোলার সময় যে-গল্পকে টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে ভাগ করে তোলা হল, তাকে আবার জোড়া দিয়ে গল্পের চেহারায় ফিরিয়ে আনার ভার হল সম্পাদকের উপর। এর কাজেও অনেক ঝামেলা, তাই একেও হয় একটি না হয় দুটি সহকারী নিতেই হয়।

যে সব লোকের কাজের ছাপ ছবিতে থাকে, অভিনেতা বাদে তাদের মধ্যে উপরের পাঁচজনই প্রধান। এদের প্রত্যেকের কাজ সম্বন্ধে আলাদা করে পরে তোমাদের বলব। তার আগে সিনেমা তৈরির যন্ত্রগুলো সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই যন্ত্রের মধ্যে সব চেয়ে জরুরী হল ক্যামেরা। আর সব কিছু বাদ দিয়ে ছবি তোলা যায়, কিন্তু ক্যামেরা বাদ দিয়ে যায় না।

গত মাঘ মাসের সন্দেশে তোমাদের একটা চিত্রনাট্য লিখতে বলেছিলাম যার বিষয় ছিল 'রাম ভালো ছেলে'। উত্তর যে খুব বেশি পাওয়া গেছে তা নয়। কিন্তু যে কজন লিখে পাঠিয়েছ, তার মধ্যে অনেকেই চিত্রনাট্যর ব্যাপারটা বেশ ভালো ভাবে বুঝছ ; এটা কম আনন্দের কথা নয়। যাদের সামান্য ভুলচুক হয়েছে তাদের দমবার কোন কারণ নেই ; চিত্রনাট্য লেখাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। লেখা বিচার করার সময় বিশেষ করে দুটো জিনিসের দিকে আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম। এক হল, লেখাটা সিনেমার উপযোগী হয়েছে কিনা ; আর দুই, রাম যে ভালো ছেলে সেটা অল্প কথায় অল্প সময়ের মধ্যে আর বেশ 'ইন্টারেস্টিং' ভাবে বোঝানো হয়েছে কিনা। যে ভুলটা অনেক নামকরা চিত্রনাট্যকারেরও হয়ে থাকে (আর স্বভাবতই সেটা তোমাদেরও কারো হয়েছে) সেটা হল, লেখাটা ঠিক সিনেমার উপযোগী না হয়ে কিছুটা গল্পের মতো, বা কিছুটা নাটকের মতো হয়ে পড়ে। যারাই কথা (সংলাপ বা ডায়ালগ) বেশি ব্যবহার করেছ তাদের লেখাতেই থিয়েটারের ঢং এসে পড়েছে। এটা হবেই, কারণ কথা জিনিসটা থিয়েটারের একেবারে একচেটিয়া। মনে রাখবে সিনেমায় যতো কম কথোপকথনে কাজ সারা যায় ততই ভালো।

একটা উদাহরণ দিই। একটা দৃশ্যে দেখানো হবে যদুবাবুর সঙ্গে মধুবাবুর দেখা হল। আর তারা দুজনে কথা বলতে শুরু করলেন। অনেক চিত্রনাট্যকারই হয়ত এই দৃশ্য এইভাবে শুরু করলেন—

যদু : নমস্কার।

মধু : নমস্কার। কী খবর ?

একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে গল্পে প্রয়োজন হলেও, চিত্রনাট্যে ওই দুটো 'নমস্কার' কথার কোন প্রয়োজন নেই কারণ সিনেমায় আমরা চোখেই দেখতে পাবো যে দুজন দুজনকে নমস্কার করছেন। তাই চিত্রনাট্যকারের উচিত হবে দৃশ্যটা এই ভাবে শুরু করা—

যদুবাবুর সঙ্গে মধুবাবুর দেখা হল। দুজনে পরস্পরকে নমস্কার করলেন।

মধু : কী খবর ?...

ছবিতে হাবে ভাবে এবং ক্যামেরার চোখ দিয়ে কী দেখানো যায় সেটা যদি সব সময় খেয়াল রাখা যায় তাহলে কথোপকথনের উপর অনেক কম নির্ভর করে চিত্রনাট্য লেখা যায়।

গল্পের ধাঁচ বলতে কী বলছি সেটা তোমাদেরই একজনের লেখা থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই। একজন গ্রাহক চিত্রনাট্য শুরু করেছেন এইভাবে—

'আষাঢ় মাসের সকাল। চড়চড়ে রোদ্দুর। রাম ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। কিন্তু এক্ষুণি দাদুর সঙ্গে কথা কয়ে এসে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কয়েকদিন ধরেই দাদুর শরীর ভালো ছিল না, প্রথমে রুটি করতে গিয়ে হাত পুড়ে যাওয়া, তারপরেই জ্বর'...

প্রথমেই বলা হয়েছে 'আষাঢ় মাসের সকাল।' ছবির শুরুতেই যদি এটা বোঝাতে হয় তাহলে কারুর মুখ দিয়ে কথাটা বলাতে হবে, আর না হয় একটা বাংলা ক্যালেন্ডার আষাঢ় মাসের পাতায় খোলা রয়েছে দেখাতে হবে। সুতরাং, গল্পের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও, চিত্রনাট্যের শুরুর পক্ষে এটা ঠিক নয়।

'চড়চড়ে রোদ্দুর' জিনিসটাও ছবিতে বোঝানো সহজ নয়।
ক্যামেরায় রোদের ছবি তুলে সেটা গ্রীষ্মকালের রোদ কি শীতকালের রোদ বোঝানো ভারী শক্ত। একজন লোককে যদি দেখানো যায় যে রোদে কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে হয়ত কিছুটা কাজ হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে হয়ত সে লোককে দিয়ে আবার মুখে বলাতে হবে—বাপ্‌রে কী গরম।
'রাম ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে'—এটা চিত্রনাট্যের পক্ষে ঠিকই আছে, তবে এখানেও আরেকটু বর্ণনা দিলে আরো ভালো হয়—যেমন, রাম কী পোশাক পরেছে, তার হাতে বই খাতা কী আছে—ইত্যাদি।
'কিন্তু এক্ষুণি দাদুর সঙ্গে কথা কয়ে এসে মনটা খারাপ হয়ে গেল।' দাদুর সঙ্গে কথা বলার দৃশ্য যদি ছবিতে না থাকে তাহলে সেটা বোঝানো যায় কী ভাবে ? ছবি শুরু হবার আগে রাম কী করেছে সেটা ত আমাদের জানার কোন উপায় নেই।
'কয়েকদিন ধরে দাদুর শরীর ভালো না।' এ জিনিসটাও যতক্ষণ না কারুর মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে, ততক্ষণ বোঝার কোন উপায় নেই। একজন লোক যে অসুস্থ সেটা ছবি দেখিয়ে বোঝানো যায়। হয়ত সে কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটে শুয়ে আছে, একজন তার মাথায় বাতাস করছে, তার খাটের পাশে টেবিলের উপর ওষুধের বোতল রয়েছে, তার মুখে থারমোমিটার গোঁজা রয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু কয়েকদিন ধরে অসুখের ব্যাপারটা কথা বলিয়েই বোঝাতে হয়।
আরেকটি চিত্রনাট্যের শুরুতে আছে—'কিন্তু কে জানত তার আজ স্কুলে গিয়ে পৌঁছতে এতটা দেরী হয়ে যাবে ? অবশ্য স্কুলটা ওর বাড়ি থেকে অনেক দূর। সব সময়ই ত হেঁটে স্কুলে যায়। এত দূর হেঁটে যেতে ভারী কষ্ট, কিন্তু কী করবে, দাদুকে বলেও আর কোন লাভ নেই। এত পয়সা কোথায় পারে দাদু যে ও রিক্সা করে স্কুলে যাবে ?' এ অংশটাও চিত্রনাট্য না হয়ে গল্প হয়ে গেছে। এর প্রত্যেকটি জিনিসই লোকের মুখ দিয়ে না বলিয়ে সিনেমায় বোঝানোর কোন উপায় নেই।
এই ধরনের ভুল ত্রুটি এড়িয়ে যে কজন চিত্রনাট্য লিখেছ তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হয়েছে তিনজনের লেখা—কাজরী দত্ত (৯৪১), ভাস্কর মিত্র (১৩১৭) ও শঙ্কর কুমার কুণ্ডু (১৯০৯)। এরা প্রত্যেকে পাঁচ টাকা পুরস্কার পাবে। এদের লেখা নীচে ছাপিয়ে দেওয়া হল।
এখানে বলে রাখি, চিত্রনাট্য শেষ হলেই তা থেকে ছবি তোলা যায় না। আগে সেই চিত্রনাট্য থেকে পরিচালকের Shooting Script তৈরি করে নিতে হয়। এই 'সুটিং স্ক্রিপ্ট' কী ব্যাপার, আর সেটা কী ভাবে তৈরি হয়, সেটা আগামীবারে তোমাদেরই একটা পুরস্কার-পাওয়া চিত্রনাট্য দিয়ে বুঝিয়ে দেবো।

ভাস্কর মিত্র

১৩১৭—বয়স ১৬

সকালবেলা রাম আর তার বন্ধুরা মিলে ইস্কুলে যাচ্ছে। সবার হাতেই বই খাতা। দুজনের হাত থেকে আবার দড়ি বাঁধা দোয়াত ঝুলছে। পাঁচজন বন্ধু একসঙ্গে যাচ্ছে—কেউ কিন্তু চুপ করে নেই অনবরত কথা বলে চলেছে পাঁচজনে। গ্রামের পথ দিয়ে যেতে গিয়ে মাঝে মাঝেই গাছপালা এসে পড়ছে আর গাছ দেখলেই রামের বন্ধুরা মাথা তুলে দেখছে গাছে পাখি আছে কিনা—পাখি চোখে পড়লেই হল, সঙ্গে সঙ্গে তারা ঢিল ছুঁড়তে শুরু করছে। রাম কিন্তু কোনবারই ঢিল ছুঁড়ছে না, বরং ওদের ঢিল ছোঁড়া দেখলেই ওর চোখেমুখে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠছে।
ইতিমধ্যে রামের চোখে পড়ল পথের মাঝে এক বুড়ি গাছতলায় বসে আছে। পরনে তার ছেঁড়া শাড়ী। গায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়ে ঝুলে পড়েছে, বয়সের ভারে শরীরটা সামনে নুয়ে পড়েছে। মাথাটা এসে ঠেকেছে প্রায় হাঁটুর কাছে। হাতের কাছে পড়ে রয়েছে একটা সরু লাঠি। বুড়ি একটু পরপরই সরু গলায় ডাকছে— 'লালিরে—অ লালু, আয় বাবা, মানিক আমার।' রাম অবাক হয়ে চেয়ে রইল বুড়ির দিকে ; কারণ আশেপাশে এমন কিছু চোখে পড়ল না যাকে দেখে মনে হয় বুড়ি তাকে ডাকছে। রামের বন্ধুরা কিন্তু এদিকে হল্লা করতে করতে এগিয়ে গেছে আর বুড়ি একটু পরপরই ডেকে উঠছে লালি লালি করে। রাম এবার আর একবার চাইল চারিদিকে আর তখনি দেখলো দূরে মাঠের ভেতর একটা লালচে রঙের ছাগল-এর বাচ্চা ঘাস খেতে খেতে একটু একটু করে ক্রমশই আরো দূরে চলে যাচ্ছে। তার গলায় বাঁধা ছোট্ট একটু দড়ি আর আরো ছোট্ট একটু ঘণ্টা। রাম একবার চাইল বুড়ির দিকে— আর একবার ছাগল আর চড়া রোদে ভরা মাঠের দিকে। তারপরই হাতের বই খাতা গাছতলায় নামিয়ে একছুট্টে চলে গেল মাঠে। ছাগলের বাচ্চাটাকে পাঁজাকোল করে এনে দিল বুড়ির কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এই নাও বুড়িমা তোমার লালিকে। বুড়ি আচমকা ব্যাপারটা না বুঝে হাঁ করে চেয়ে রইল আর রাম ততক্ষণে বই খাতা তুলে আবার দৌড় দিয়েছে কেননা রামের বন্ধুরা ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে।

কাজরী দত্ত

৯৪১—বয়স ১৩½

সকালবেলা। কাল রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়েছে। বারো বছরের ছেলে রাম স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সার্ট গায়ে গলিয়ে, বই-এর ঝোলা কাঁধে নিয়ে, জুতো জোড়ায় পা গলাতে যাবে এমন সময় শোনা গেল দাদু কাশছেন খক্ খক্। রাম এগিয়ে গিয়ে বলল, —দাদু কাল রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে তোমার কাশিটা দেখছি খুবই বেড়েছে। দাঁড়াও, আমি একটু মালিশ করে দিয়ে যাই। তাক থেকে মালিশের কৌটা পেড়ে মালিশ করে দিয়ে সে সযত্নে কম্বলটা দাদুর গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে বলল— আমি না আসা পর্যন্ত তুমি আর উঠে ঠাণ্ডা লাগিয়ো না। এবার সে রাস্তায় বেরুল। চারিদিকে কাল রাত্রের দুর্যোগের চিহ্ন। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে বাঁশের সাঁকোটার কাছাকাছি এসে সে দেখল প্রতিদিনকার মত তরকারীওলা ঝুঁকে পড়ে মাথায় প্রকাণ্ড ঝাঁকা নিয়ে গুটি গুটি ওপার থেকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ সে কাদায় পা পিছলে বোঝা শুদ্ধ পড়ে গেল। রাম চেঁচিয়ে বলল দাঁড়াও লক্ষ্মণকাকা, আমি এসে ধরছি। এই বলে সে এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে তুলল আর চারিদিক থেকে তরকারীগুলো কুড়িয়ে এনে ঝাঁকায় তুলে দিল। এবার সে একটু তাড়াতাড়িই হাঁটতে লাগল। স্কুলের ফটকটার কাছে পৌঁছে অন্ধ কৃষ্ণদাস বৈরাগীকে রোজকার মত উষাকীর্তন না গেয়ে উবু হয়ে জবুথবু ভাবে বাঁধানো বটগাছটার তলায় বসে থাকতে দেখা গেল।
অভ্যাস মত রাম পকেট থেকে পয়সা বার করে তার হাতে গুঁজে দিলে। এমন সময় ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা শোনা গেল।
রাম—এই রে দেরী হয়ে গেল, বলে এক দৌড়ে স্কুলের বড় ফটকটার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শঙ্করকুমার কুণ্ডু

১৯০৯—বয়স ১৫

ডাক্তারবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে চলেছে একটি

ছেলে স্কুলে। হাতে বই, জামার পকেটে একটা পেন্সিল গোঁজা, পায়ে জুতো নেই কিংবা কাঁধেও ব্যাগ নেই, পরনে হাফ প্যান্ট আর জামার গায়ে ডোরা কাটা। কৃষ্ণাঙ্গ দেহ, দীর্ঘতনু ছেলেটি এগিয়ে চলেছে স্কুলে, ডাক্তারবাবুর ঘড়িটা ঢং ঢং করে দশটা বাজিয়ে ঘোষণা করল দশটা বাজে।
পথে পড়ে একটি দীঘি বা পুকুর, জলের গভীরতা আছে বলেই মনে হয় সেখানে পুকুরের পাড় ঘেঁষেই খেলা করছে গোটা কয়েক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, আর ওপাশে কাপড় কাচছে ও বাসন মাজছে কয়েকজন মেয়েলোক। হঠাৎ সঙ্গীদের 'গেল গেল' হতচকিত স্বরে চমকে উঠে রাম দেখল নিরুপায়ের মত কতকগুলি ছেলে তাদের সঙ্গীকে ডুবে যেতে দেখছে আর বিলাপ করছে, অন্যদিকে তখন ছেলেটি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে নিজেকে বাঁচাবার জন্য, একবার মাথাটা ডোবে আবার মাথা ওঠায় যেন সেটা করুণ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে। ছেলেটি বই, পেন্সিল ফেলে রেখেই ঝাঁপ দিল জলে ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য। সাঁতরে যেয়ে নিয়ে এল ছেলেটাকে পাড়ে। ওর সর্বাঙ্গ তখন ভিজে জলসিক্ত। একজন বৃদ্ধা বলল, আহা কি সোনার চাঁদ ছেলে গো, বাবা, তা তোমার নাম কি ?
'আমার নাম শ্রীরামেশ্বর মণ্ডল, সকলে রাম বলে ডাকে,' প্রত্যুত্তর দিল রাম।
'তোমার বাবার নাম কি !' আমার বাবা ও মা দুজনেই মারা গেছেন, বাবার নাম ছিল শ্রীপরমেশ্বর মণ্ডল।' 'তাহলে তুমি কার কাছে থাক ?' পাশ থেকে প্রশ্ন করল আর একজন মেয়েলোক।
'আমি থাকি আমার দাদুর কাছে, একমাত্র দাদু ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'
পেছন থেকে আর একজন স্ত্রীলোক বলে উঠল 'আহা, বাছাধনের কেউ নেই গো !' আর একজন বলে উঠল, 'তোমরা মানুষ না কিগা ! দেখছ না ছেলেটা ভিজে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে, চল, তুমি আমাদের বাড়ি চল। সেখানে তোমার কাপড় শুকানোর পর না হয় বাড়ি ফিরে যেও বুঝলে।'
রামসহ সকলেই প্রস্থান করল। (চিত্রনাট্য এখানেই সমাপ্ত)

গত বছরটা সিনেমা তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে তোমাদের জন্য আর সিনেমার কথা লেখাই হয়ে ওঠেনি। তোমাদেরই লেখা কিছু চিত্রনাট্য নিয়ে এর আগেকার আলোচনা করেছিলাম (শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৫)। এবার চিত্রনাট্য থেকে 'সুটিং স্ক্রিপ্ট' (shooting script) কিভাবে তৈরি হয় সেটা একবার দেখা যাক।
চিত্রনাট্যে যে জিনিসটা লিখে বোঝানো হয়েছে, সেটাকে সিনেমার নিজস্ব ভাষায় কী ভাবে বোঝানো হবে, সেটাই লেখা থাকে সুটিং স্ক্রিপ্টে। আগেই বলেছি যে সিনেমার ভাষা শুধু ছবির ভাষা নয়। শব্দেরও ভাষা। শব্দ বলতে মানুষের কথাবার্তা, পাখির ডাক, মেঘের ডাক, রেলগাড়ির শব্দ, গানবাজনা ইত্যাদি যা কিছু আমরা কানে শুনি সবই বোধ হয়। সুটিং স্ক্রিপ্টে তাই ছবির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের কথাটাও থাকে একটা বাড়ি তৈরি করতে যেমন প্ল্যান বা নক্শার প্রয়োজন হয়। সিনেমা করতে গেলেও ঠিক তেমনিই দরকার হয় সুটিং স্ক্রিপ্টের। এ জিনিসটা ঠিকভাবে তৈরি না হলে পরিচালক কাজের সময় খেই হারিয়ে একগাদা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসেন।
লিখে গল্প বলা আর সিনেমার গল্প বলার মধ্যে তফাৎ থাকলেও, দুটোর মধ্যে একটা মিল আছে যেটা লক্ষ্য করার মত।
তোমরা জান যে গল্প লিখতে গেলেই সেটাকে বাক্য বা sentence এ ভাগ ভাগ করে লিখতে হয়। সিনেমার গল্পকেও একটা নিজস্ব কায়দায় ভাগ ভাগ করে বলার প্রয়োজন হয়। ছবি তোলার কাজটাই হয় টুকরো টুকরো ভাবে। তারপর সেই ছবির টুকরো পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে সিনেমার গল্প তৈরি হয়।
এই ছবির টুকরোকে বলা হয় 'শট' (short)। শটগুলো ঠিক কথার মত কাজ করে। তবে এমন অনেক কথা আছে যা একটা মাত্র শটে বোঝানো সম্ভব হয় না যেমন একটা শট্-এ দেখা গেল—

শুধু এই শটটার যদি মানে করতে হয় তাহলে দাঁড়ায়— 'একটা লোক আকাশের দিকে চেয়ে আছে।' কিন্তু তার পরে শটটা যদি হয় এই—

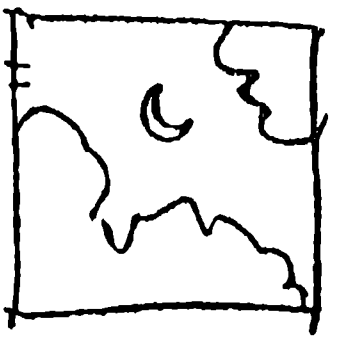

—তাহলে দুটোয় মিলে অন্য মানে হয়ে যাচ্ছে— 'একটা লোক আকাশে চাঁদ দেখছে।'
পরিচালক যদি বোঝাতে চাইতেন যে 'একটা লোক এরোপ্লেন দেখছে', তাহলে অবিশ্যি দ্বিতীয় শটটা চাঁদের না হয়ে এরোপ্লেনের হত। কিন্তু এরোপ্লেনের ব্যাপারে পরিচালক একটা কায়দা করতে পারতেন যেটা চাঁদের ব্যাপারে সম্ভব নয়। এরোপ্লেনের শব্দ আছে, চাঁদের নেই। ধরা যাক প্রথম শটটার সঙ্গে সঙ্গে একটা এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল। তক্ষুণি মনে হবে যে 'লোকটা আকাশে এরোপ্লেন দেখছে।' ফলে দুটোর জায়গায় একটা শটেই পরিষ্কার হয়ে গেল।
শট্-এর পর শট্ জুড়ে সিনেমার এক একটা scene বা দৃশ্য, দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে এক একটা sequence (পরিচ্ছেদ বা chapter), আর Sequence এর পর Sequence জুড়ে একটা পুরো সিনেমার গল্প তৈরি হয়। শট, সীন, সিকুয়েন্স ইত্যাদি পর পর কীভাবে আসবে সেটাও সুটিং স্ক্রিপ্টে লেখা থাকে।
একটা কথা এই ফাঁকে বলে রাখি—যিনি সিনেমা তৈরি করবেন, তিনি যদি একটু আধটু ছবি আঁকতে পারেন তাহলে তাঁর পক্ষে খুব সুবিধে হয়। সুটিং স্ক্রিপ্ট তৈরি করার ব্যাপারে আঁকাটা অনায়াসেই কাজে লাগানো যেতে পারে।
অবিশ্যি এই আঁকা খুব ভালো না হলেও চলে, কারণ এটা নিজের দরকারেই আঁকা— মোটামুটি জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে পারলেই হল।
সন্দেশের গ্রাহক (১৩১৭) ভাস্কর মিত্রের পুরস্কার পাওয়া 'রাম ভালো ছেলে' চিত্রনাট্যের প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে কি রকম সুটিং স্ক্রিপ্ট হতে পারে সেটা দেখা যাক। চিত্রনাট্যে আছে—
'সকালবেলা রাম আর তার বন্ধুরা মিলে ইস্কুল যাচ্ছে। সবার হাতেই বই খাতা। দুজনের হাত থেকে আবার দড়ি বাঁধা দোয়াত ঝুলছে। পাঁচজন বন্ধু একসঙ্গে যাচ্ছে— কেউ কিন্তু চুপ করে নেই। অনবরত কথা বলে যাচ্ছে পাঁচজন। গ্রামের পথ দিয়ে যেতে মাঝে মাঝে গাছপালা এসে পড়ছে, আর গাছ দেখলেই রামের

বন্ধুরা মাথা তুলে দেখছে গাছে পাখি আছে কিনা। পাখি চোখে পড়লেই হল, সঙ্গে সঙ্গে তারা ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করছে। রাম কোনবার ঢিল ছুঁড়ছে না, বরং ওদের ঢিল ছোঁড়া দেখলেই ওর চোখে মুখে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠছে।'
এই হল প্রথম প্যারাগ্রাফ।
সুটিং স্ক্রিপ্ট করার আগে একটা জিনিস লক্ষ্য করা দরকার। চিত্রনাট্যে বলা হয়েছে 'অনবরত কথা বলে যাচ্ছে পাঁচজন'—অথচ কী কথা বলছে সেটা বলা হয়নি। সিনেমার জন্যে কথাগুলোর দরকার, কাজেই সুটিং স্ক্রিপ্টে সেটা লিখে দিতে হবে।
রামের চার বন্ধুর নাম দেওয়া যাক—হারু, বিশু, পটলা ও কানাই।

রাম ভালো ছেলে (সুটিং স্ক্রিপ্ট)

প্রথম দৃশ্য। গ্রামের রাস্তা। সকাল বেলা

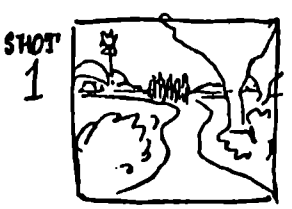

দূর থেকে দেখা যায় পাঁচজন ছেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। তারা কথা বলছে—কিন্তু এতদূর থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।
একজন ছেলে রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে একটা গাছের দিকে তাগ করে মারল।
একটা পাখির ডাক শোনা গেল। মনে হল সেটা গাছ থেকে উড়ে পালাল। ছেলেগুলো আবার হাঁটতে শুরু করল।

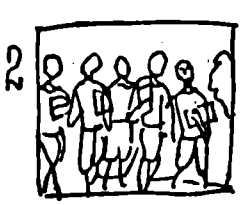

এবার পাঁচজনকে আরো কাছ থেকে দেখা যায়। তারা হাতে বই খাতা দোয়াত ইত্যাদি নিয়ে হেঁটে চলেছে—বোঝাই যায় তারা ইস্কুল যাচ্ছে।
ক্যামেরাও এদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।
এবারে ছেলেদের কথা বোঝা যায়।
বিশু : হাতের চেয়ে গুলিতে আরো ভালো টিপ হয়।
পটলা : আর তীর ধনুক ?
কানাই : সবচেয়ে ভালো বন্দুক, তারপর তীর ধনুক, তারপর গুলতি।
হারু : আমার হাতের টিপ বন্দুকের চেয়েও ভালো।
কানাই : অ্যাঃ।
হারু : সেবারে এক ঢিলে একটা শালিক মারলাম যে ! রামের সামনে ত। রাম, তোর মনে নেই ?

রামকে বেশ কাছ থেকে দেখা যায়। সে গম্ভীর। হারু আবার প্রশ্ন করে।
হারু (নেপথ্যে) : কীরে—মনে নেই ?
রাম : আছে।

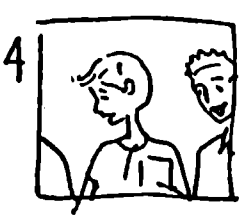

কাছ থেকে হারু ও কানাই। কানাই তার মুখে দুঃখের ভাব আনে।
কানাই (ঠাট্টার সুরে) : রামের মনটা যে বড্ড নরম—তাই ওর দুঃখু হয়েছিল।

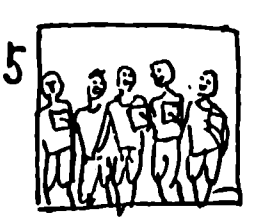

আবার পাঁচজনকেই দেখা যায়। কানাইয়ের কথায় রাম ছাড়া সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে।
কাছেই একটা পাখি ডেকে ওঠে।
সবাই হাঁটা থামিয়ে বাঁয়ে উপর দিকে দেখে।

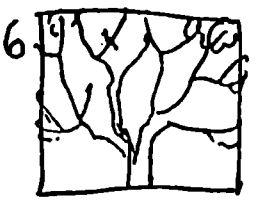

একটা শিমুল গাছের ডালে একটা বুলবুলি বসে আছে। সেটা আবার ডেকে উঠল।

কাছ থেকে হারু ও কানাই।
কানাই (ফিস্‌ফিস্ করে) : দেখা, তোর হাতের টিপ।
হারু (ফিস্‌ফিস্ করে) : দাঁড়া।
হারু ঢিল তুলতে নীচু হয়।

রাম গম্ভীর মুখে হারুর দিক থেকে গাছের দিকে দেখে।

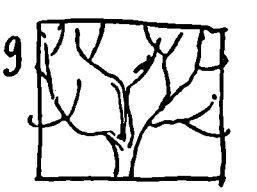

একটা ডাল থেকে পাশের আরেকটা ডালে পাখিটা উড়ে গিয়ে বসে।

রাম আবার হারুর দিকে দেখে।

হারু হাতে ঢিল নিয়ে পা টিপে টিপে দল থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে আসে।

হারু তাগ করে।

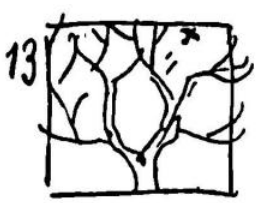

পাখিটা হঠাৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়।

হারু বোবা বনে যায়।

রাম হেসে আবার স্কুলের দিকে রওনা দেয়।

'পথের পাঁচালি' সুটিং-এর আগে

চিত্রনাট্যের প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে ১৫টা শটে এইভাবে একটা সুটিং স্ক্রিপ্ট হতে পারে। এছাড়া যে আর কোনভাবে হতে পারে না তা নয়। একই গল্প যেমন দুজন লেখক দু'রকমভাবে লিখতে পারেন, সেরকম একই চিত্রনাট্য থেকে বিভিন্ন পরিচালক তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে সুটিং স্ক্রিপ্ট করে নিতে পারেন। আমি এখানে শুধু একটা উপায় বাতলে দিলাম।

এবারে চিত্রনাট্যের সঙ্গে আমার সুটিং স্ক্রিপ্টের যে তফাতগুলো রয়েছে সেটার কারণ বলি।

প্রথমে, চিত্রনাট্যে আছে পাঁচজনেই অনবরত কথা বলছে। অথচ সুটিং স্ক্রিপ্টে রামকে দিয়ে বিশেষ কিছুই বলানো হয়নি, কারণ আমার মনে হয়েছিল যে রাম যদি পাখি মারার ব্যাপারটা পছন্দ না করে, তাহলে তার বন্ধুদের কাণ্ডকারখানা দেখে সে নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে। সুতরাং এ অবস্থায় কথা না বলে মুখ ভার করে থাকাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক নয় কি ?

দ্বিতীয়তঃ চিত্রনাট্যে রয়েছে 'মাঝে মাঝে গাছপালা এসে পড়ছে' আর গাছে পাখি দেখলেই ছেলেরা ঢিল মারছে। মাঝে মাঝে ব্যাপারটা সিনেমায় দুবার দেখালেই দিব্যি বুঝিয়ে দেওয়া যায়। বার বার দেখাতে গেলে জিনিসটা একঘেঁয়ে হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

পাখি উড়ে পালানোর ঘটনাটা অবিশ্যি চিত্রনাট্যে নেই, কিন্তু এটার ফলে হারুর বিরক্তি আর হতাশা, আর তার সঙ্গে রামের ফুর্তিতে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়। রামের চরিত্রটাও এতে বেশ বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

এবার আরেকবার উপরের শটগুলোর দিকে দেখ। ১ নং শটে ছেলেদের খুব দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। একে বলে Long Shot। ২ নং শটে অপেক্ষাকৃত কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে ; একে বলে Medium Shot বা Med Shot। ৩ নং শট ২ নং-এর চেয়েও বেশি কাছের শট ; একে বলে Close Shot। পাখিটাও যে Long Shot সেটা বুঝতেই পারছ। অন্য শটগুলো যে কী সেটা তোমরা ছবি দেখে নিজেরাই আন্দাজ করে নিতে পারবে।

এ ছাড়াও আরো কয়েকরকম শট হয়, সেটার কথা তোমাদের পরের বার বলব।

'সিনেমার কথা' প্রথম প্রকাশিত হয় 'সন্দেশ'-এ ১৩৭৪ সালের ভাদ্র-আশ্বিন, অর্থাৎ শারদীয়া সংখ্যায়। বাকি চার কিস্তি অনিয়মিত ভাবে বেরোয় যথাক্রমে মাঘ ১৩৭৪ ; বৈশাখ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫ এবং ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৬। ইচ্ছে থাকলেও, সময়ের অভাবে উনি এই প্রবন্ধটিকে আর শেষ করতে পারেননি।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

"সেরা মডেল, দুর্দান্ত ফটোগ্রাফার, দারুণ ফিল্মপ্রডিউসার, পাঁচতারা হোটেলের ডিনার, তারপরই পেটের গণ্ডগোল। ভাগ্যিস্! পুদীনহরা আছে।"

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য, এ্যাডভার্টাইজিং এক্‌জিকিউটিভ। পুদীনহরা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আমরা রোজই অনুরূপ প্রতিক্রিয়া জানতে পারছি।

বিজ্ঞাপনের জগত সত্যিই অদ্ভুত জগত। 72 ঘণ্টা ঘুম নেই। সকাল, দুপুর, রাতের খাওয়া সবই অসময়ে। শরীর কি আর সইতে পারে?
ফলে প্রথম হামলা হয় আপনার পেটের ওপর।
তাই এই হামলার মোকাবিলা করতে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য ভরসা করেন একমাত্র পুদীনহরা-তে।

পুদীনহরা ঃ প্রকৃতির চিরসবুজ বরদান।

পুদীনহরাতে আছে মিন্ট (পুদীনা) তেলের সংমিশ্রণ যা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত এবং অত্যন্ত কার্যকর। অন্যান্য কৃত্রিম ওষুধ যা স্নায়ুতন্ত্রে প্রভাব বিস্তার করে ও ব্যথা দমিয়ে দেয়, পুদীনহরা সেখানে পাচনতন্ত্রে স্থানীয়ভাবে কাজ করে ও ব্যথা কমিয়ে আরাম দেয়। তাছাড়া পুদীনহরায় আছে চমৎকার *এ্যান্টিস্প্যাসমোডিক (যন্ত্রণা উপশমকারী), কারমিনেটিভ (গ্যাস নিবারণকারী) এবং হজমশক্তির গুণ।*

পুদীনহরা ঃ কার্যকরী অথচ কোনো সাইড এফেক্ট নেই।

সারা বিশ্বে এখন রাসায়নিক পদার্থের সাইড এফেক্ট নিয়ে গভীর উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। সত্যি বলতে কি এর মধ্যে কিছু কিছু ওষুধ সম্প্রতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুদীনহরা হ'ল এমন এক প্রাকৃতিক উপচার যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই।

একবার পুদীনহরা ব্যবহার করুন। আপনি সর্বদা এতেই ভরসা করবেন।

যেমন করেছেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য এবং আরও লক্ষ লক্ষ পুদীনহরা ব্যবহারকারীগণ।

Pudin® Hara লিক্যুইড এবং পার্ল্‌স্

সঠিক এফেক্ট, নেই সাইড এফেক্ট

HTA.5718.98.BEN

Dabur

For more information on Pudin Hara, write in with your name, sex, date of birth, education, profession, complete address and phone no. to:
Dabur Pudin Hara (AM), P.O. Box 7326, New Delhi - 110 065.

ANANDAMELA 6 MAY 1998 REGD. NO. WB/CC/264
MH/MBI-SOUTH/683/97 TN/MS(C) 731. RS. 15.00

কোথায় পাবেন এমন সাদা!

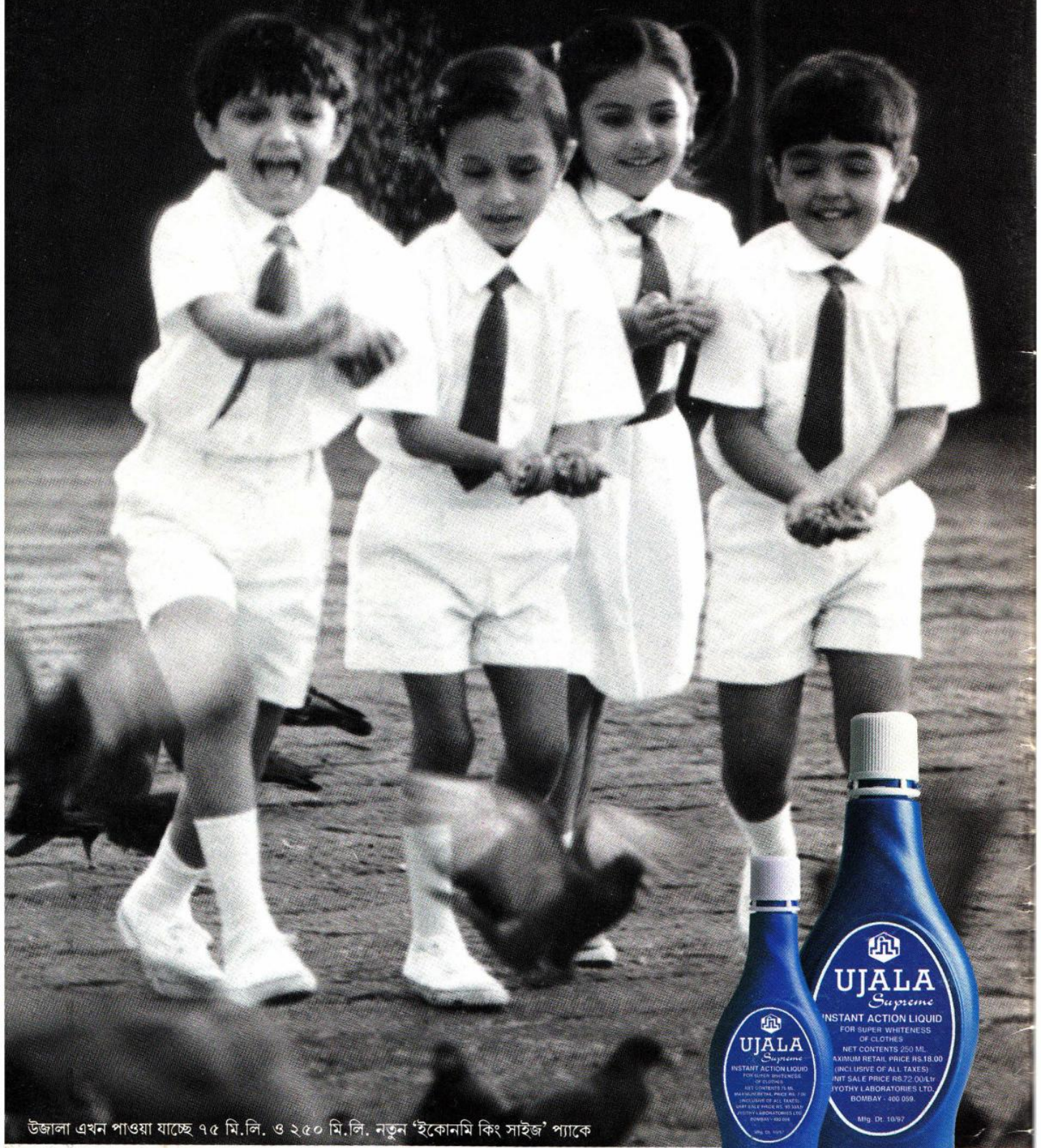

উজালা এখন পাওয়া যাচ্ছে ৭৫ মি.লি. ও ২৫০ মি.লি. নতুন 'ইকোনমি কিং সাইজ' প্যাকে

A product of Jyothy Laboratories Ltd.

চার ফোঁটায় চমক

Situations/JL/1/98